ও৩ম্

সংশোধিত সংস্করণ

সত্যার্থ প্রকাশ

উদীয়মান প্রশ্ন গর্জনশীল উত্তর

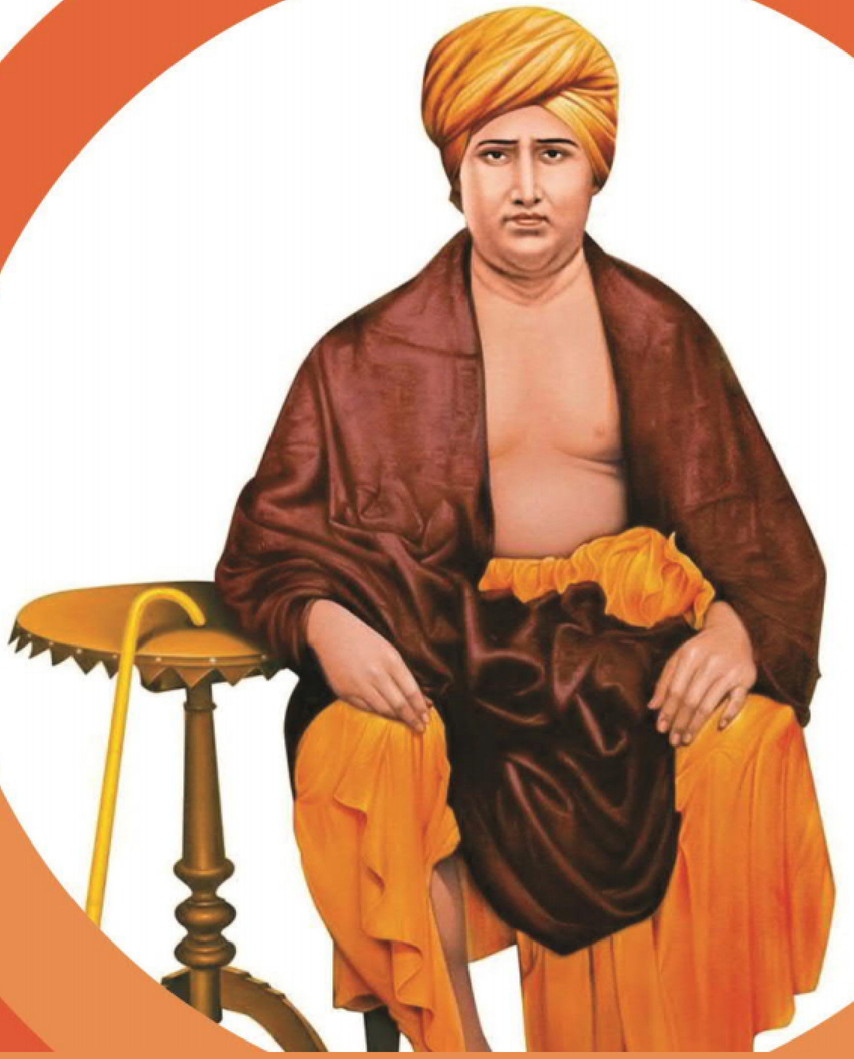

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

— আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক

তিথি জ্যেষ্ঠ শুক্ল অষ্টমী বিক্রম সম্বৎ 2075, তারিখ 20 জুন 2018 তারিখে উপরাষ্ট্রপতি আবাসে ‘বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ’ গ্রন্থের উন্মোচন করছেন মহামান্য উপরাষ্ট্রপতি শ্রীমান এম. ভেঙ্কাইয়া নাইডু জী

9.10.2011 তারিখে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রো. আভাস কুমার মিত্র এবং প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রো. এ. আর. রাও অনুসন্ধান ভবনের উদ্বোধন করছেন

ওতম্

সত্যার্থ প্রকাশ

উদীয়মান প্রশ্ন — গর্জনশীল উত্তর

লেখক

আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক

সম্পাদক

বিশাল আর্য

(M.Sc. Theoretical Physics)

অনুবাদক

আশীষ আর্য

প্রকাশক

শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস

(বৈদিক এবং আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান)

বেদ বিজ্ঞান মন্দির, ভাগলভীম, ভিনমাল জেলা-জালোড়

(রাজস্থান) পিন- 343029

দ্বিতীয় সংস্করণ

বর্ষ 2018

শ্রী কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী
ভাদ্রপদ কৃষ্ণা অষ্টমী
বিক্রম সংবৎ 2075

03 সেপ্টেম্বর 2018

সংখ্যা - 1000

মূল্য - 100 রু. বেদ রক্ষার্থে কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা রাশি

প্রকাশক :
শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস
(বৈদিক এবং আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান)
বেদ বিজ্ঞান মন্দির, ভাগলভীম, ভিনমাল জেলা-জালোড়
(রাজস্থান) পিন- 343029
দূরভাষ -02969-222103, 9829148400
Email: swamiagnivrat@gmail.com
Website: www.vaidicphysics.org, www.vaidicscience.com

সূচিপত্র

1. **ভূমিকা** 01

2. **সত্যার্থ প্রকাশ কি আমাদের লজ্জিত করে ?** 05

(ক) ব্রহ্মচারী থাকা সত্ত্বেও ঋষি কীভাবে গর্ভাধান আদির পদ্ধতি লিখলেন ?

(খ) দুগ্ধপানের জন্য ধাত্রী নিয়োগ।

(গ) নিয়োগ বিষয়।

3. **পথভ্রষ্টদের দম্ভ** 20

(ক) 'সত্যার্থ প্রকাশ' কি অনেক ভুলভ্রান্তিতে ভরা একটি রচনা ?

(খ) হিন্দ, হিন্দি ও হিন্দু কি ততটাই গ্রহণযোগ্য, যতটা আর্যাবর্ত, আর্যভাষা এবং আর্য ?

(গ) শূদ্র নিচ নয়... তাদের উপনয়ন সংস্কার আদির বিষয়ে...

(ঘ) বেদে কি মূর্তিপূজা ও মাংসাহারের বিরোধিতা নেই...

4. **অন্যান্য কিছু সম্ভাব্য শঙ্কার সমাধান** 41

(ক) মহর্ষি দয়ানন্দ জি সূর্য আদি লোকেও মনুষ্য জাতির অস্তিত্বের কথা লিখেছেন...

(খ) মহর্ষি লিখেছেন যে মানুষ যৌবনকালে পৃথিবী থেকে বৃক্ষের ন্যায় উৎপন্ন হয়েছিল...

(গ) আর্যদের বাড়িতে শূদ্ররা যখন রান্না করবে, তখন মুখ বেঁধে রান্না করবে, কেন...

ভূমিকা

আর্যসমাজীদের জন্য সত্যার্থ প্রকাশ একটি আধার গ্রন্থ। আনন্দকন্দ ভগবান্ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী রচিত যত গ্রন্থ আছে, তার মধ্যে **'সত্যার্থ প্রকাশ'** একটি প্রধান ও সর্বজনীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথমার্ধে মণ্ডনাত্মক শৈলীতে এবং উত্তরার্ধে খণ্ডনাত্মক শৈলীতে মানবজাতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের জ্ঞান বৈদিক ও আর্য পদ্ধতিতে দেওয়া হয়েছে। বহু মানুষ স্বামীজীর এই গ্রন্থ পাঠ করেই সত্য সনাতন বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করে জীবনভর এর প্রচার-প্রসারে সমর্পিত ছিলেন। এই অমূল্য গ্রন্থটি দেশকে অনেক আত্মত্যাগী বীর উপহার দিয়েছে।

সত্যার্থ প্রকাশ-এর বিভিন্ন প্রকাশক এর অনেক সংস্করণ বের করেছেন এবং এটিকে আরও ভালোভাবে স্পষ্ট করার জন্য বিশেষ পাদটীকাও যুক্ত করেছেন। কখনও কখনও এই গ্রন্থের ভাষা পরিবর্তন করে একে সমসাময়িক করার জন্য অথবা কিছু অংশ বাদ দিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। এটি এই গ্রন্থের প্রতি সুবিচার হবে না। সমাজবাদী, সর্বোদয়ী, বর্ণাশ্রমবিরোধী, বস্তুবাদী, পাশ্চাত্য ও আধুনিক মতানুসারী এবং কিছু তথাকথিত আর্য সমাজী ইত্যাদি মানুষ এই গ্রন্থের কট্টর সমালোচক ছিলেন। কিন্তু খোলা মনে পুরো গ্রন্থটি পাঠ করার পর এদের মধ্যেও অনেকে এই গ্রন্থের প্রশংসক হয়েছেন।

কিছু তথাকথিত আর্য সমাজী এবং অন্যান্য মানুষের দ্বারাও 'সত্যার্থ প্রকাশ' নিয়ে অনেক সংশয় ও আপত্তি তোলা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্বানদের দ্বারা মাঝেমধ্যে কিছু সংশয় নিরসনও করা হয়েছে। পৌরাণিক, খ্রিস্টান ও মুসলিমদের সাথে হওয়া শাস্ত্রীয় বিতর্কে এই সমস্ত আক্ষেপ ও সংশয়ের শাস্ত্রীয় ও প্রসঙ্গোচিত সপ্রমাণ উত্তর এবং আলোচনা আর্য বিদ্বানরা দিয়েছেন।

নিয়োগ এবং ধাত্রীকে নবজাতক শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য রাখা ইত্যাদি বিষয়ে শাস্ত্রীয় নিরসন পাওয়া গেলেও, এখনও যৌক্তিক ও ব্যবহারিক উত্তরের প্রয়োজন আছে, এমন কথা অনেকে বলেন। সৃষ্টি উৎপত্তি সংক্রান্ত সংশয়গুলোর বিজ্ঞানসম্মত উত্তরও প্রত্যাশিত। বিজ্ঞানের জানকার আর্য বিদ্বানরাও বৈদিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, সামাজিক ইত্যাদি বিষয়ে সারগর্ভ চমৎকার সাহিত্য রচনা করেছেন, কিন্তু বেদ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নাবলির উপর খুব কম লিখেছেন। সূর্যে (বসু) মনুষ্যাদি প্রাণীদের অস্তিত্ব থাকা এবং পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে সৃষ্টির শুরুতে যুব প্রজন্মের জন্ম নেওয়া — এমন প্রশ্নগুলোর সমাধান দেওয়া আমাদের সামনে এক বড় সমস্যা। নিয়োগ এবং ধাত্রী-র প্রকরণে আজকের পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে যৌক্তিকতা প্রমাণ

করা কঠিন কাজ। বর্তমান ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শূদ্র বর্ণের প্রসঙ্গে কথা বলা বেশ কঠিন। এইসব এবং অন্যান্য বিদ্বানদের তোলা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা আচার্য অগ্নিব্রত জী ভেবেছেন, যা সময়ের দাবিও বটে। আচার্য অগ্নিব্রতজী নৈষ্ঠিক, শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস, ভাগলভীমের প্রতিষ্ঠাতা-প্রধান এবং আচার্য। তিনি বেদে বিজ্ঞানের স্বরূপের একজন গবেষক এবং আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের তাদের স্তরে গিয়ে বেদ বিজ্ঞান বোঝানোর জন্য সমর্পিত এক ব্যক্তি হন। সত্যার্থপ্রকাশ-এর প্রসঙ্গে কিছু সময় আগে যে প্রশ্নগুলো তোলা হয়েছিল, আচার্যজী তার কিছু সেই সময়েই ''সত্যার্থ প্রকাশ কি আমাদের লজ্জিত করে?'' এবং ''পথভ্রষ্টদের দম্ভ'' নামক প্রবন্ধের মাধ্যমে দিয়েছিলেন। সেগুলোর সংকলন এবং আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর আমাদের বিশেষ অনুরোধে এখন একটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

আমি এই সংস্থার সাথে প্রায় 13 বছর ধরে যুক্ত এবং এখানকার কাজে আমি প্রভাবিত। আপনার সম্প্রতি প্রকাশিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বৈজ্ঞানিক ভাষ্য **'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ'** নামে বিশাল এক গ্রন্থ রূপে বিশ্বে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে, যা বর্তমান ভৌতিকীর জন্য এক ক্রান্তিকারী ও বিস্ময়কর গ্রন্থ। এটি 2018 সালের জুন মাসে দেশের উপরাষ্ট্রপতি শ্রীমান ভেঙ্কাইয়া নাইডু উন্মোচন করেছিলেন।

''সত্যার্থ প্রকাশ — উদীয়মান প্রশ্ন গর্জনশীল উত্তর'' পুস্তকটিতে মূলত 3 টি অধ্যায় আছে।

(1) প্রথম অধ্যায় — **''<u>সত্যার্থপ্রকাশ কি আমাদের লজ্জিতও করে?</u>''** এই বিষয়ের অন্তর্গত নিয়োগ প্রথা, ধাত্রীর নিযুক্তি, গর্ভাধান বিধি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

(2) দ্বিতীয় অধ্যায় — **''<u>পথভ্রষ্টদের দম্ভ</u>''**, সত্যার্থ প্রকাশে সংশোধন; হিন্দু, হিন্দি ও হিন্দুত্বের মান্যতা; সত্যার্থ প্রকাশ গ্রন্থের ত্রুটি; শূদ্র (অনাড়ি), মূর্তিপূজা, মাংসাহার-শাকাহার ইত্যাদি বিষয়ের সমাধান এখানে আছে।

(3) তৃতীয় অধ্যায়— **''<u>অন্যান্য জটিল শঙ্কার সমাধান</u>''** এতে আছে —

(ক) সূর্যতে মনুষ্যাদি প্রাণীদের অস্তিত্ব।
(খ) সৃষ্টি উৎপত্তির সময় প্রাণী ও মানুষের ভূগর্ভের খোলসের মধ্যে তরুণ অবস্থায় জন্ম আর
(গ) শূদ্র এবং পাক-কর্ম (রান্না) সম্পর্কে বিশেষ ব্যবহারিক সমাধান।

আমি এই তিনটি অধ্যায় পড়েছি এবং এগুলো যৌক্তিক, ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক শৈলীতে

যথাযথভাবে আলোচিত বলে মনে হয়েছে। ঋষি দয়ানন্দ সত্যার্থপ্রকাশে মানুষের জীবন গঠন, প্রাণীকুলের ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গলের ভাবনা এবং বৈদিক সিদ্ধান্তের যে প্রতিপাদন করেছেন, তা মাথায় রেখেই এই পুস্তকটিতে আলোচনা করা হয়েছে।

এতদিন পর্যন্ত আমরা আর্যরা অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রশ্নকর্তাদের উত্তর দিয়ে এসেছি। পৌরাণিক, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইসলাম, সাম্যবাদী ইত্যাদির সাথে আর্য বিদ্বানরা শাস্ত্রার্থ করতেন। সেই যুগ যেন এখন শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে আমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বাদানুবাদ শুরু করেছি। ‘বাদে বাদে জায়তে তত্ত্ববোধঃ’ (তর্কের মাধ্যমেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়) — এটি ঠিক, তবে নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির মাধ্যমে তত্ত্বজ্ঞান হওয়া কঠিন। এর থেকে সমস্যার সমাধান হওয়া জরুরি। কিন্তু তেমন লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। সত্যার্থপ্রকাশের নতুন সংস্করণ যদি শুদ্ধ এবং বিভিন্ন টীকা-টিপ্পনীতে ভরপুর হয়, তবে সাধারণ মানুষের এটি বুঝতে খুব সুবিধা হবে। সকল আর্য বিদ্বানরা যদি সত্যার্থপ্রকাশ সম্পর্কে নিজেদের মতামত লিখে একটি স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ সমিতিকে প্রদান করেন এবং তাঁরা যদি একটি সত্য, সারগর্ভ ও প্রামাণিক ‘সত্যার্থপ্রকাশ’ দেন, এটাই সকল আর্যজনদের ইচ্ছা। ‘সত্যার্থ প্রকাশ’ আমাদের শ্রদ্ধার গ্রন্থ এবং এটি আমাদের মেধাবী ও বিবেকবান করে তোলে। হওয়া তো উচিত এই যে, সত্যার্থ প্রকাশ-এর প্রত্যেক সমুল্লাসের (অধ্যায়ের) উপর আলাদা আলাদা বিশ্লেষণাত্মক পুস্তক তৈরি হোক। ‘ঈশ্বরের 108 নাম’ বিষয়ক প্রথম সমুল্লাসের উপর পুস্তক উপলব্ধ আছে। অন্যান্য কিছু সমুল্লাসের উপরও ছোটখাটো কিছু পুস্তক পাওয়া যায়। সকল সমুল্লাসের উপর উত্তমভাবে বিশ্লেষণ করে পুস্তক লিখলে সত্যার্থ প্রকাশ-এর নীতিগুলো আরও পুষ্ট হবে। সত্যার্থ প্রকাশ-এর উপর করা আক্ষেপ, আঘাত এবং শঙ্কাগুলোর বিদ্বানদের দ্বারা সশক্ত উত্তরও পাওয়া উচিত। সত্যার্থ প্রকাশ আমাদের আর্যসমাজিদের কাছে একটি জ্ঞানযোগের মতো, যার আলোতে আমরা দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চলি।

‘‘সত্যার্থ প্রকাশ — উদীয়মান প্রশ্ন গর্জনশীল উত্তর’’ এই পুস্তক্তির মাধ্যমে সত্যার্থপ্রকাশ-এর মহিমা আরও উজ্জ্বল করা হয়েছে। আচার্যজী সময়ে-সময়ে বৈদিক ধর্মের উপর মানুষের তোলা প্রশ্নগুলোর যথাযথ বিবেকপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন। অধ্যয়নশীল লোকেদের জন্য যদি এই সমস্ত বিবিধ প্রশ্নের সমাধান/উত্তর একটি পুস্তক আকারে পাওয়া যায়, তবে খুব ভালো হবে। এতে সমাজের কল্যাণ হবে। যাই হোক, আচার্যজী একটি অনেক বড় লক্ষ্য নিয়ে চলছেন, যার ফলে আর্য সমাজ বা বেদের সকল সিদ্ধান্ত স্বয়ংই প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে।

এই পুস্তকটি এর আগে 2011 সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল, এখন এটি এর সংশোধিত সংস্করণ। আশা করি পাঠকরা এটিকেও আগের মতোই স্বাগত জানাবেন।

ওতম্ শম্

প্রো. ড. বসন্ত মদনসুরে (বিদ্যার্থী)

M.Tech. Ph.D.

প্রাক্তন প্রধান, অপারম্পরিক উর্জা ও বিদ্যুৎ

প্রকৌশল বিভাগ, (মহারাষ্ট্র)

পাঞ্জাবরাও দেশমুখ কৃষি বিদ্যাপীঠ, আকোলা

বর্তমান-শ্রুতিসৌরভ, ইঞ্জিনিয়ার্স কলোনি, বড়ী

উমরী, আকোলা

সত্যার্থ প্রকাশ কি আমাদের লজ্জিত করে?

(সেপ্টেম্বর 2005 সালে লেখা নিবন্ধ)

গত মাসে অর্থাৎ আগস্ট 2005 সালে আমি আজমগড় ও কাশী ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সেখানে আজমগড় আর্য সমাজে আমি বেশ কিছু বক্তৃতা দিয়েছিলাম। অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করার সময়, আর্য সমাজের একজন বিদ্বান, যিনি একটি স্নাতকোত্তর কলেজের সংস্কৃত বিভাগের উপাচার্য এবং একজন অত্যন্ত আবেগপ্রবণ আধ্যাত্মিক বানপ্রস্থী বিদ্বান, আমার সামনে মঞ্চেই তিনটি প্রশ্নের একটি চিরকুট পাঠান। যখন আমি মঞ্চে সেই বিষয়ে আলোচনা শুরু করি, তখন অনুষ্ঠানের আয়োজক আমার বন্ধু ব্রহ্মচারী শ্রী নরেন্দ্রজী জিজ্ঞাসু আমাকে অনুরোধ করেন যে আমি যেন আমার আগের বিষয়ের উপরই বক্তব্য রাখি এবং ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর মঞ্চ থেকে না দেই। যখন মঞ্চ থেকে নেমে আমি সেই বিদ্বানদের সাথে আলোচনা করলাম, তখন তারা বললেন যে ওই তিনটি প্রশ্ন শুধু আমাদেরই নয়, বরং আর্য সমাজের অনেক বড় বড় বিদ্বানদেরও লজ্জিত করে। অনেক লোকের সাথে দেখা করার কারণে ব্যস্ততা থাকায় তখন সেগুলোর সমাধান করার অবসর পাইনি। সেখান থেকে আমি কাশীতে আসি, তো সেখানে আর্য সমাজীরা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাতু প্রকৌশল বিভাগে সৃষ্টিতত্ত্বের উপর একটি বক্তৃতার আয়োজন করেন। তা শুনে আয়োজকরা পাণিনি কন্যা মহাবিদ্যালয়ের আচার্যা মেধাদেবী জীকে বলেন যে আজকের বক্তৃতা শুনে আর্য সমাজের মাথা গর্বে অনেক উঁচু হয়ে গেছে এবং আরও অনেক কথা বলেন। সেখানেই একজন ঋষিভক্ত কর্মী আলোচনার সময় আমাকে বলেন যে জানি না কেন আর্য সমাজীরা 'ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা'-র বৈদিক বিজ্ঞানের দিকটি ভুলে গেছেন এবং শুধু 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এর উপরই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন, যার কিছু কথা মাথা নত করার মতো।

আমি এই বিষয়ে একমত যে বৈদিক বিজ্ঞানের ব্যাপারে আর্য সমাজের কোনো পরিকল্পনা নেই। কোনোমতে কাজ চলছে এবং খণ্ডনেই সব শক্তি ব্যয় করছে। বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জের সামনে তারা অসহায় এবং সেদিকে নজরও দিচ্ছে না বা দেওয়ার সাহসও রাখছে না। তা সত্ত্বেও আমি এই বিষয়ে খুব দুঃখিত ও বিচলিত হয়েছি যে আমাদের ঋষিভক্ত বন্ধুরা মহান ঋষির অমর গ্রন্থের কিছু বিষয়ে মাথা নত করছেন, লজ্জা অনুভব করছেন। আমার দৃষ্টিতে তো 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এর প্রতিটি কথা স্বাভিমান বা আত্মমর্যাদা জাগ্রত করার মতো। যদিও আমি এখন কোনো প্রকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চক্করে পড়তে চাই না, কিন্তু জানি না কেন এই প্রশ্নগুলো আমাকে

কিছু ভাবতে বাধ্য করেছে। গম্ভীর এবং লজ্জিত করার মতো মনে করা প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ —

1. ব্রহ্মচারী থাকাকালীন ঋষি কীভাবে গর্ভাধান আদির বিধি লিখে দিলেন?
2. ধাত্রীর দুধ খাওয়ানোর জন্য ধাত্রী কোথা থেকে আনা হবে, যখন নিজের মা খাওয়াতে পারছেন না? ধাত্রীর নিজের সন্তান তখন কী খাবে? মায়ের দুধ সর্বোত্তম খাবার; এই বৈজ্ঞানিক কথাগুলো উপেক্ষা করে ঋষির পক্ষ থেকে মাকে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া শুধু অনুচিতই নয়, বরং আপত্তিজনক এবং ধাত্রীর সন্তানের প্রতি অন্যায়ও বটে।
3. নিয়োগ প্রথা এবং তার সমর্থন করা শুধু অনুচিতই নয়, বরং লজ্জাজনকও।

প্রিয় পাঠকগণ! এই তিনটি প্রশ্নের উপর আর্য বিদ্বানরা অনেক শাস্ত্রার্থ করেছেন, নিবন্ধ লিখেছেন। পণ্ডিত মনসারাম জীর 'বৈদিক তোপ' এবং পণ্ডিত বুদ্ধদেবজী মিরপুরীর গ্রন্থগুলোতে এগুলোর শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাথে সমাধান করা হয়েছে। পাঠক দয়া করে এই গ্রন্থগুলো পড়ার কষ্ট করলে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে যাবে। 'নির্ণয় কে তট পর'-এ ও কিছু আলোচনা আছে। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই অনুভব করি যে, এখন পর্যন্ত যে উত্তরগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলোতে তর্কের চেয়ে শাস্ত্রীয়তার আধিক্য বেশি আছে। একটি গালির উত্তরে 4 টি গালি দেওয়ার শৈলীও আমাদের বিদ্বানদের মধ্যে ছিল। যেমন কেউ নিয়োগ নিয়ে আক্ষেপ করলে আমাদের বিদ্ধানরা তার উত্তরে নিজের বিষয়ের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেয়ে পৌরাণিক অশ্লীলতার উপর লেখালেখি করে আক্রমণ করতেই বেশি মনোযোগী ছিলেন। তাতে তিক্ততা আরও বেড়েছে। তবে হ্যাঁ, অন্যের উপর পাল্টা আঘাত করাও প্রয়োজন আছে, কিন্তু এই বিষয়ের উপরও ধ্যান দেওয়া উচিত যে, যে ব্যক্তি আমাদের শাস্ত্রকে প্রমাণ বলে মানে না এবং পুরাণকেও মানে না, এমন মুসলিম, খ্রিস্টান ও নাস্তিকদের পৌরাণিক অশ্লীলতা শুনিয়ে আমাদের কথা কীভাবে প্রমাণিত হবে? যারা স্বয়ং ব্যাস ঋষি, হনুমান ও পাণ্ডবদের জারজ সন্তান ও ব্যভিচারী বলে, তাকে তাদের নিয়োগকর্তা বা নিয়োগজ হওয়ার প্রমাণ দেওয়াটা আমাদের কথাকে কীভাবে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে পারে? আমি মনে করি আমাদের বিদ্বানরা এই বিন্দুতে কখনোই বিচার করেননি এবং আজও করছেন না। এই কারণেই এই ভাবে ধাত্রীর দুধের বিষয়ে যারা সুশ্রুত-এর প্রমাণ দেন এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ দেন, তখন ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা সুশ্রুত ও ইতিহাস উভয়ের উপর বিদ্রূপ করে বর্তমান বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে ঋষি দয়ানন্দকে আনাড়ি বলেন, যার উত্তর দেওয়ার জন্য উপযুক্ত প্রমাণগুলো পূর্ণ কার্যকর প্রমাণিত হয় না। এই কারণেই আজ

অনেক বিদ্বান আধ্যাত্মিক পুরুষ ও কঠোর ঋষিভক্তরাও এই প্রশ্নগুলোর কারণে লজ্জিত অনুভব করেন।

যদিও আমি আর্য সমাজ, বেদ ও ভারত রাষ্ট্রের মূলকে বাঁচানোর ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, যার দিকে আমাদের দুর্ভাগা আর্য জনদের নজরই নেই। বেদের উপর নতুন নতুন উপায়ে আক্রমণ হচ্ছে, তার উপর আমাদের বিদ্বানরা স্বয়ং আর্য সমাজের তৃতীয় নিয়মের উপর হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে বিশ্বাস করেন না। আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের শিকড় নাড়িয়ে দিয়েছে, আর এখানে আমরা আছি, যাদের ঘুমই ভাঙছে না। কথার জালে শ্রোতাদের ফাঁসিয়ে দান-দক্ষিণা নিয়েই নিজেদের কর্তব্যের ইতি টানছেন। তো কেউ-কেউ বড়-বড় ভবন তৈরি করাকেই লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছেন। বেদকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল যারা বলেন, তাদের কোথাও কোনো বিজ্ঞানী জিজ্ঞেস করে না, তবুও উপাধিধারী বা পদাধিকারী বা মঠধারী বিদ্বানদের অহংকারের কোনো সীমা নেই।

নিজেদের ঘরে বসে সারা বিশ্বের কাছে নিজেদের বড়াই করছেন। বাইরে বেরিয়ে সত্য-মিথ্যার ডঙ্কা বাজানোর সাহস নেই। যদি কেউ এমনটা ভেবে চলার প্রস্তুতি শুরু করে, তবে তাকে উপেক্ষা করা হয়। কেউ সহযোগিতা করে না, দু-একজন হয়তো চিঠি লিখে নিজেদের আন্তরিকতা প্রকাশ করেন। যেন আমি কোনো নতুন মত বা পথ চালু করেছি। কী করবো ? আমি আপনজনদের ব্যবহার দেখে ক্ষুব্ধ, কিন্তু মিথ্যা পথেও মিশে যেতে পারি না আর না সুধাংশু, শ্রীরাম শর্মা, ভীমসেন শর্মা, আচার্য অভয়দেব, স্বামী সত্যানন্দ হতে পারি। সুখে-দুঃখে এই ঘরেই জীবন-মরণ। এই কারণেই আর্যদের (আর্য সমাজীদের, কারণ প্রকৃত আর্য তো এখন বিরল) সম্মানকে আজও আমি নিজের সম্মান মনে করি। এই কারণেই আমি এসব লিখতে বাধ্য হচ্ছি।

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলো আমি এই কারণে বাদ দিচ্ছি কারণ পাঠকরা নিশ্চয়ই সেগুলো ইতিমধ্যে পড়েছেন। সময়ের অভাবে প্রমাণের সাথে বিস্তারিত লিখতে পারছি না। পাঠকগণ দয়া করে সেই প্রমাণগুলোকে আমার যুক্তির সাথে মিলিয়ে সমাধানের বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

1. ঋষি গর্ভাধান আদির বিধি সম্পর্কে কীভাবে জানলেন ?

উত্তর — প্রতিটি বিষয় জানার জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারই প্রয়োজন হয় না। যদিও এই বিষয়ে বেদাদি মন্ত্রগুলোকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা নিজেই যথেষ্ট। ঋষি বেদ, শাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ আদি গ্রন্থের মাধ্যমে শরীর বিজ্ঞানে পারদর্শী বিদ্বান ছিলেন। এই কারণে তাঁর চার

আশ্রমের সমস্ত ধর্ম ও কর্তব্য, রাজা-প্রজা, শিষ্য-গুরু, ব্যবসা, কৃষি, পাকশালা (রান্নাঘর), দর্শন, যোগ, বিজ্ঞান — সব ক্ষেত্রের পূর্ণ জ্ঞান ছিল, তাই তিনি তা লিখতে পেরেছেন। কেউ হয়তো বলবে ঋষি তো রাজা ছিলেন না, তবে 'ষষ্ঠ সমুল্লাস' কীভাবে লিখলেন ? কেউ বলবে ঋষি তো সৃষ্টি হতে দেখেননি, তবে কেন লিখলেন ? ঋষি ব্যবসায়ী, কৃষক বা অর্থনীতিবিদও ছিলেন না, তবে তাঁদের বিষয়ে কীভাবে লিখলেন ? এসব প্রশ্ন খুব একটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না। ঋষিরা তো মন্ত্রদ্রষ্টা এবং ব্রহ্মদ্রষ্টা হন। তাঁরা চাইলে যোগের মাধ্যমেও সমস্ত জাগতিক বিদ্যার জ্ঞান অর্জন করতে পারেন; তবে ঋষির এই জ্ঞান নিয়ে সন্দেহ কেন? এখন যদি কেউ বলে যে — যা অশ্লীল মনে হয় সেগুলোকে স্পষ্টভাবে বলা কি খুব দরকার ছিল ? তার উত্তর হল, বিজ্ঞানের বিদ্যার্থী এসব বিষয় সম্পর্কে জানে এবং পড়ে। এটি না পড়লে কেউ শরীর বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। ঋষিই একমাত্র এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি সম্পূর্ণ মানবজাতির জন্য জীবনযাপনের একটি ব্যবস্থা দিয়ে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন; অন্য সংস্কারকরা কেবল অবাস্তব কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। পৃথিবীতে পা রাখার যোগ্যতা নেই, অথচ তারা আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখাতেন। এই কারণেই ঋষি দয়ানন্দ সবচেয়ে অনন্য, মহান এবং শ্রেষ্ঠ। মানুষের নির্মাণ গর্ভাধান থেকেই শুরু হয়, বীজ বপন থেকেই বৃক্ষ নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। যদি বীজ বপনের সঠিক বিধি ও বিজ্ঞান শেখানো না হয় এবং ফসল কাটার লম্বা-লম্বা উপদেশ দেওয়া হয়, তবে কি সেগুলো সার্থক হবে? না, একেবারেই নয়। এই কারণেই যথার্থ দ্রষ্টা ঋষিরা মানব নির্মাণের পূর্ণ পরিকল্পনা নিয়ে সংসারে এসেছিলেন। তারপর যখন বেদে গর্ভাধানের উপদেশ আছে, তখন দয়ানন্দ এমনটা করে কি অপরাধ করেছেন ? কোনো কী রোগী সুস্থ হয়েই ডাক্তার হয় ? কোনো রোগী যদি ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে যে আপনার কী এই রোগ কখনও হয়েছে ? যদি না হয়ে থাকে, তবে আমাকে আপনি কীভাবে ওষুধ দিতে পারেন ? এমন রোগী নিশ্চিতভাবেই অজ্ঞ হিসেবে গণ্য হবে। রোগের ওষুধ বলার জন্য রোগী হওয়া আবশ্যক নয়, বরং রোগ বিষয়ক শাস্ত্রের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। একইভাবে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ দয়ানন্দ গৃহস্থ ধর্মের উপদেশ লোকহিতার্থে দিয়েছেন, যা কেবল সঠিকই নয় বরং অত্যন্ত আবশ্যকও।

2. ধাত্রীর প্রসঙ্গে —

এখানে ঋষির বচন হল— ''প্রসূতি 6 দিন পর্যন্ত শিশুকে নিজের স্তন্যপান করাবেন, এরপর ধাত্রী স্তন্যপান করাবেন, তবে ধাত্রীকে যেন বাবা-মা উত্তম পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান। যারা দরিদ্র এবং ধাত্রী রাখতে অক্ষম, তারা গরু বা ছাগলের দুধে উত্তম ঔষধি — যা বল, পরাক্রম ও

আরোগ্য বৃদ্ধি করে, সেগুলোকে বিশুদ্ধ জলে ভিজিয়ে, ফুটিয়ে এবং ছেঁকে নিয়ে দুধের সমান জল মিশিয়ে শিশুকে পান করাবেন। জন্মের পর শিশু ও তার মাকে অন্য কোনো স্থানে রাখুবেন যেখানে বাতাস শুদ্ধ আছে; সেখানে সুগন্ধি ও দর্শনীয় বস্তুও রাখুবেন। জন্মের পর এমন জায়গায় ভ্রমণ করানো উচিত যেখানে বাতাস শুদ্ধ আছে। আর যদি দেশ-কাল ভেদে ধাত্রী, গরু, ছাগল আদির দুধ পাওয়া না যায়, তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নিবেন। কারণ প্রসূতি স্ত্রীর শরীরের অংশ থেকেই শিশুর শরীর গঠিত হয়, তাই প্রসবের সময় স্ত্রী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন, একারণেই প্রসূতি স্ত্রীর দুধ পান করাবেন না। দুধ বন্ধ করার জন্য স্তনবৃন্তে এমন ঔষধি প্রলেপ দিবেন যাতে দুধ নিঃসৃত না হয়। এমনটা করলে দ্বিতীয় মাসেই প্রসূতি পুনরায় যুবতীর ন্যায় সতেজ হয়ে উঠবেন। ততকাল পর্যন্ত পুরুষ ব্রহ্মচর্য পালন করে বীর্য নিগ্রহ করবেন। এইভাবে যে স্ত্রী-পুরুষ নিয়ম পালন করবেন, তাদের উত্তম সন্তান, দীর্ঘায়ু, বল, পরাক্রমের বৃদ্ধি হতে থাকবে, যার দ্বারা সন্তান উত্তম বল, পরাক্রম যুক্ত, দীর্ঘায়ু তথা ধার্মিক হবে।''

(সত্যার্থ প্রকাশ, দ্বিতীয় সমুল্লাস)

''যদি শিশু দুধ পান করতে চায়, তবে মা তাকে দুধ পান করাবেন। যদি মায়ের দুধ না থাকে, তবে অন্য কোনো স্ত্রীর পরীক্ষা করে তার দুধ পান করাবেন। 6 দিন পর্যন্ত শিশু মায়ের দুধ পান করবে এবং সেই স্ত্রীও নিজের শরীরের পুষ্টির জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার উত্তম ভোজন করবেন। ষষ্ঠ দিনে প্রসূতি স্ত্রী বাইরে বের হবেন এবং সন্তানের দুধের জন্য কোনো ধাত্রী রাখবেন। তাকে ভালো খাবার ও পানীয় দেবেন। তিনি সন্তানকে দুধ খাওয়াবেন এবং লালন-পালন করবেন কিন্তু তার মা যেন ছেলের ওপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখেন।''

(সত্যার্থ প্রকাশ, চতুর্থ সমুল্লাস)

ঋষি বাক্যের উপর বিচার — এখানে ঋষির সম্পূর্ণ বিচার পড়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় —

1. ছয় দিন পর্যন্ত মা-ই দুধ পান করাবেন, যদি তার দুধ থাকে। এটি একটি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা।
2. মায়ের দুধ না আসলে শুরু থেকেই ধাত্রীর ব্যবস্থা করতে হবে আর যদি মায়ের দুধ আসে, তবে 6 দিন পর ধাত্রীর ব্যবস্থা করতে হবে এবং মা হতে আসা দুধ বন্ধ করে দিতে হবে।
3. যদি পিতা-মাতা দরিদ্র হন, তবে ধাত্রীর পরিবর্তে গরু, ছাগল আদির ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সেই দুধে বিভিন্ন প্রকার সর্বোত্তম ঔষধ মিশ্রিত করে তাকে মায়ের দুধের মতো উপযোগী বানিয়ে তবেই কাজে লাগাতে হবে।

4. যে ধাত্রীকে দুধ পান করানোর জন্য রাখা হবে, তাকেও পরীক্ষা করতে হবে।

5. ধাত্রীকে সর্বোত্তম খাবার খাওয়াতে হবে, যাতে দুধের পরিমাণ ও গুণমান উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

এই বিষয়গুলো নিয়ে বিচার করলে তিনটি কথা সামনে আসে —

1. শিশু যেন সব পরিস্থিতিতে সুস্থ, সুসংস্কৃত এবং বলবান হয়। তিনি সদ্য প্রসূতি মায়ের হলুদ ঘন দুধকে অনেক ভিটামিন এবং অ্যান্টি-বায়োটিকের ভাণ্ডার বলে মনে করেন, যার দ্বারা শিশুর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, এই কারণেই ঋষি ধাত্রী রাখার বিধান 6 দিন পর দিয়েছেন। এই কয়েক দিনের দুধই বিশেষ গুণসম্পন্ন হয়, একই অবস্থা পশুদের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এরপর দুধ স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন ঋষি ধাত্রীর ব্যবস্থা করতে বলেছেন। এমনটা বলেননি যে প্রসবের পরপরই ধাত্রী রেখে দিতে হবে, যখন সেই সময়ে আরও বেশি দুর্বলতা থাকে। এতে স্পষ্ট যে তাঁরা সেই দুধের গুরুত্ব বুঝতেন। এই কারণে শিশুকে তা থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়, কারণ ধাত্রীর কাছে তেমন দুধ পাওয়া সম্ভব নয়। 6-7 দিন পর ধাত্রী এবং মায়ের দুধের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। এই কারণে মায়ের দুধের বিশেষত্বের সুবিধা শিশুটিও পায় এবং মানুষের জন্য মানুষের দুধই সর্বোত্তম হয়, এই কারণে ধাত্রীর ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে কারণ সে-ও একজন মা। যদি তা উপলব্ধ না হয়, তবে ছাগল বা গরুর দুধে ঔষুধি মিশিয়ে গুণসম্পন্ন করে তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ শিশুর স্বাস্থ্য ও সংস্কারাদির পূর্ণ খেয়াল রাখা হয়েছে।

2. শিশুর সাথে-সাথে ঋষির দৃষ্টি সেই মায়ের স্বাস্থ্যের দিকেও যায়, যিনি সদ্য প্রসবের কারণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এটি সকলেই স্বীকার করবেন যে প্রসবের ফলে অত্যধিক দুর্বলতা আসে। তার ওপর শিশু যদি বারবার দুধ পান করতে থাকে, তবে সেই দুর্বলতা কাটতে অনেক দেরি হবে। আবার ঋষির দ্বিতীয় সমুল্লাসের শেষ বাক্যগুলোর দিকে বিশেষ নজর দিলে জানা যায় যে, ঋষি এটাও বিচার করেছেন যে যদি ওই দুর্বল অবস্থার মধ্যেই পুনরায় গর্ভাধান করা হয়, তবে আগত সন্তানও মায়ের সাথে-সাথে অত্যন্ত দুর্বল হবে। ঋষি চতুর্থ সমুল্লাসে উপরোক্ত বাক্যগুলোর উপর কিছু লিখেছেন যে, গর্ভধারণের পর এক বছর পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক হওয়া উচিত নয়। তিনি এই ভাবনাও রাখেন যে গর্ভাধান করার সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের শরীরেই বল ও পরাক্রমের পূর্ণতা থাকা উচিত। এই কারণেই গর্ভাধানের পূর্বে উভয়েরই উত্তম খানপানের ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলা হয়েছে, তাহলে পরবর্তী সন্তানের জন্য প্রসূতির দুর্বলতাকে কীভাবে উপযুক্ত মনে করা যেতে পারে ? এই

কারণে তাঁর লক্ষ্য এটাও যে, একদিকে প্রথম সন্তান যেন বলবান ও নীরোগ হয়, অন্যদিকে প্রসূতিও যেন যথাসম্ভব দ্রুত সম্পূর্ণ সুস্থ ও বলবান হয়ে ওঠেন, যাতে পুনরায় গর্ভধারণ হলেও মা এবং পরবর্তী সন্তানের স্বাস্থ্য ভালোই থাকে। তিনি আজকাল ব্যবহৃত কৃত্রিম গর্ভনিরোধক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে উভয়কে স্বেচ্ছাচারী ভোগী বানাতে চান না, বরং সর্বত্র ব্রহ্মচর্য ও বলের গুরুত্বকে প্রদর্শন করেন। এই কারণেই দুর্বল প্রসূতিকে স্তন্যপান না করানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কারণ তাঁর উদ্দেশ্য মাতাকে পুনরায় বলবান করে তোলা, মাতাকে তাঁর সন্তানের লালন-পালন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া নয়; তা না হলে তিনি ধাত্রীর দ্বারা করা লালন-পালনের উপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ কেন দিতেন? এর থেকে এটাও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মাতা যখন পুনরায় যুবতী (সুস্থ ও সবল) হয়ে উঠবেন, তখন যেভাবে ঔষুধ ব্যবহারের মাধ্যমে দুধের ক্ষরণ বন্ধ করা হয়েছিল, ঠিক একইভাবে অন্যান্য ঔষুধের প্রয়োগে পুনরায় দুধের ক্ষরণ শুরু করে স্তন্যপান করানো যেতে পারে। কারণ সেই পরিস্থিতিতে মাতার প্রসবজনিত কষ্ট ও দুর্বলতার কারণ দূর হয়ে যায়। 'কারণাভাবাৎকার্য়ভাবঃ' অর্থাৎ কারণ মিটে গেলে কার্যও মিটে যাওয়া উচিত। যদিও এই বিষয়টি ঋষির বাক্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রতীয়মান হয় না, তবুও বিদ্বজ্জনেরা তাঁর ভাবনাকে অনুধাবন করে আমার এই মতকে অবশ্যই ঋষির অভিপ্রায়ের অনুকূল বলেই মনে করবেন।

ঋষি দয়ানন্দ ধাত্রীর পরীক্ষার কথাও বলেছেন। এই পরীক্ষা কেমন হবে, তা স্পষ্ট নয়। তবে আমরা অনুমান করতে পারি যে ধাত্রী উত্তম গুণ, কর্ম ও স্বভাবযুক্ত এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া প্রয়োজন। তখন এই কাজ পরিবারের অন্যান্য মায়েরা, যাঁদের সন্তানরা কিছুটা বড় হয়ে গেছে এবং যাঁদের পর্যাপ্ত দুধ আসে, তাঁরা সহজভাবে এবং ততটা সময় পর্যন্ত করতে পারেন, যতক্ষণ না প্রসূতি সম্পূর্ণ সুস্থ ও বলবান হয়ে উঠছেন। তারপর তিনি তাঁর সন্তানকে নিজেই সামলে নেবেন। নিশ্চিতভাবেই সেই ধাত্রী উত্তম কুলসম্পন্ন ও সুসংস্কারিত হবেন এবং তিনিই সন্তানের পূর্ণ হিত সাধনে সক্ষম হবেন। সাধারণ নিরক্ষর, সংস্কারহীন ও দুর্বল স্ত্রী ধাত্রী হওয়ার যোগ্যতা রাখবেন না।

3. মাতা ও শিশুর স্বার্থ রক্ষার পর ধাত্রীর স্বার্থের কথাও ঋষি ভাবেন —

যারা দরিদ্র এবং ধাত্রী রাখতে পারেন না, তাদের জন্য গরু বা ছাগলের দুধ ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে ধাত্রীর দুধের বিনিময়ে তাকে অর্থ দেওয়া হবে, যা

তার পরিবারের ভরণপোষণে সহায়তা করবে। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে দরিদ্র কিন্তু গুণবতী ও বলবর্তী মহিলারাও ধাত্রীর কাজ করতে পারেন, ফলে তাদের এই কাজ একটি ব্যবসার মতো হয়ে যাবে। যেহেতু ধাত্রী সদ্যপ্রসূতি নন, তাই স্তন্যদানের কারণে তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো ঝুঁকি তৈরি হবে না। তার জন্য সর্বোত্তম খাবারের ব্যবস্থাও করতে হবে, যাতে তার এবং তার নিজের সন্তানের স্বাস্থ্যের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব না পড়ে। কেউ বলতে পারেন যে, প্রসূতি মা নিজের সন্তানকেও দুধ খাওয়াতে পারছেন না অথচ ধাত্রী দুটি সন্তানকেই পালন করছেন, এটা কি তার নিজের সন্তানের প্রতি ঘোর অন্যায় নয় ? এটা কি দরিদ্রদের শোষণ নয় ? আমার প্রশ্ন হল, প্রসবজনিত দুর্বলতাকে কি স্তন্যদানজনিত দুর্বলতার সাথে তুলনা করা যায় ? যদিও এটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। যারা এই বিষয়ে হইচই করেন, তারা কি নিজেরাও নিজেদের ক্ষেত্রে একই রকম আচরণ করছেন না ? এই ধরণের লেনদেন ছাড়া সমাজ ব্যবস্থা কি কখনো চলতে পারে ? একজন ধনী ব্যক্তি দরিদ্র রিকশা-ওয়ালার রিকশায় ছায়ায় বসে আরাম করে যান, অন্যদিকে অন্যজন (রিকশাওয়ালা) সেই অর্থের বিনিময়ে রোদ, বৃষ্টি ও শীতে পায়ে রিকশা টানার কঠিন পরিশ্রম করেন। রিকশা-ওয়ালার সন্তান তার বাবার এই অবস্থা দেখে দুঃখিত হয়, অন্যদিকে ধনীর সন্তান আয়েশ করে তার বাবার সাথে গল্প করে যায়। একজন ধনী ব্যক্তি কোনো গরিবকে দিয়ে মজুরি করায়, কোদাল চালানোয়, কৃষক খেতে ঘাম ঝরায় আর ধনীরা এসি বাংলোতে বসে থাকেন। তাকে বা কোনো ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ারকে যদি একদিনের জন্যও এমন কঠিন কাজে লাগানো হয়, তবে তাদের শরীরই ভেঙে পড়বে। তাহলে এগুলো কি সমাজ ব্যবস্থার অনিবার্যতা নয় ? যদি রিকশাওয়ালা বা মজুরদের দিয়ে কাজই না করানো হয়, তবে তাদের পালন করবে কে ? যদি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা অবস্থাতেই তাদের খেতে দেওয়া হয়, তবে কি তাদের বা সমাজের কোনো মঙ্গল হবে ? তবে হ্যাঁ, তাদের পরিশ্রমের যদি সঠিক মূল্য না দেওয়া হয় বা শোষণ করা হয়, তবে অবশ্যই তা ঘোর অন্যায় ও পাপ হবে। তার সাথে পূর্ণ মানবিক ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করে সম্পূর্ণরূপে ধন আদির ব্যবস্থা করলে তবেই সমগ্র সমাজ সুখী হবে। একইভাবে ঋষি ধাত্রীর কাজ করা মায়েদের পরিবারের কথাও খেয়াল রেখেছেন, যাতে ধাত্রীর স্বাস্থ্যের উপর কোনো কুপ্রভাব না পড়ে এবং বাচ্চার জন্যও দুধ উপলব্ধ থাকে। এর জন্য তিনি ব্যবস্থা করেছেন যে, যারা ধাত্রী রাখেন তারা যেন তাকে সর্বোত্তম খাবার নিজের হাতে খাওয়ান। তিনি এটি বলেননি যে

তাকে কেবল অর্থ দিয়ে দেওয়া হোক যাতে সে নিজের বাড়িতে গিয়ে ভালো খাবার খেতে পারে। কারণ তিনি মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিলেন যে সম্ভবত সে বাড়িতে অর্থ সঞ্চয় করতে থাকবে এবং নিজে সঠিক ও পর্যাপ্ত খাওয়া-দাওয়া করবে না, যার ফলে তার নিজের এবং উভয় বাচ্চার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। এই কারণে তার প্রতি অন্যায়ের বিষয়টি এখানে গ্রাহ্য হতে পারে না এবং এটি তার পেশাও বটে। তখন তাকে এই কাজ করেই নিজের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তাই যেভাবে শ্রমিকের কাছ থেকে পরিশ্রম করানো ততক্ষণ অন্যায় নয় যতক্ষণ তাকে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে, ঠিক সেভাবেই ধাত্রীকে সঠিক অর্থ ও খাবার না দিয়ে ধাত্রীর কাজ করানো নিশ্চিতভাবেই অন্যায় হবে। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। কেউ বলতে পারেন যে দুধ খাওয়ানো এক বিষয় আর পরিশ্রম করানো আলাদা বিষয়। এমন কথা যারা বলে, তাদের রোদে পাথর ভাঙানো উচিত অথবা রিকশায় 4-5 জন যাত্রী বসিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে রিকশা চালানো উচিত, তারপর জিজ্ঞাসা করা উচিত যে এটি দুধ খাওয়ানোর চেয়ে সহজ না কঠিন ? প্রকৃতপক্ষে, এই ধরণের চিন্তা সাম্যবাদী আদর্শের প্রভাবের পরিণাম, যারা শ্রমিকদের খেপিয়ে ধনীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করাকেই সমাজের ন্যায় মনে করে। অথচ তারা নিজেরা এসি বাংলোতে থেকে অত্যন্ত সামান্য বেতনে নিজেদের গৃহভৃত্যদের শোষণ করে। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র — সবই সংসারে আছে। কর্মফল অনুযায়ী এই ব্যবস্থা পরমাত্মার অধীন। তবে মানুষের নিজের দিক থেকে শোষণ না করে সবার প্রতি, বিশেষ করে দুঃখীদের প্রতি করুণার ভাব রাখা উচিত এবং দুঃখীদের উচিত ধনীদের দেখে দ্বেষ, ঈর্ষা ও বিরোধের ভাব না রেখে প্রসন্নতার ভাব রাখা, তবেই সমাজে সুখ-শান্তি বজায় থাকতে পারে। সবার কর্ম যখন সমান নয়, তখন ফল কীভাবে সবাই সমান পেতে পারে? জীব কর্মে স্বাধীন, তখন তাকে সমান করাই বা কীভাবে সম্ভব ?

হ্যাঁ, এটুকু মনে রাখা দরকার যে ধাত্রী যেন প্রসূতি না হন, কারণ এমন পরিস্থিতিতে তার সঙ্গে ন্যায়বিচার হবে না। তার সন্তান কিছুটা বড় হয়ে যদি তার অন্নপ্রাশনও হয়ে গিয়ে থাকে অথবা অন্ততপক্ষে সে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বলবান হয়, তবে অবশ্যই তার সঙ্গে ন্যায়-বিচার হবে এবং তার ও তার পরিবারের মঙ্গল হবে এবং সদ্যজাত প্রসূতা ও নবজাতক শিশুরও কল্যাণ হবে। উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, প্রেমের ভাব তৈরি হবে। সমাজে একতা ও সমতার এক সুখদ অনুভূতি আসবে।

3. নিয়োগ প্রসঙ্গে —

এই বিষয়ে বিচার করার পূর্বে আমাদের ঋষির সেই দুটি মতের উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত, যিনি জিতেন্দ্রিয়তাকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করেন। সর্বপ্রথম মহর্ষি দয়ানন্দ জীর মান্যতা হল, যে যুবক বা যুবতী জিতেন্দ্রিয় থাকতে পারেন এবং রাষ্ট্র ও সমাজের বিশেষ হিত সাধন করতে চান, তারা বিবাহ নাই বা করলেন। কিন্তু এমন সংকল্প গ্রহণকারীদের তিনি সচেতনও করেছেন যে, এই কাজ পূর্ণ বিদ্যাসম্পন্ন জিতেন্দ্রিয় এবং নির্দোষ যোগী নারী ও পুরুষের। এটি অত্যন্ত কঠিন কাজ যে কামের বেগকে থামিয়ে ইন্দ্রিয়গুলোকে নিজের বশে রাখা, তবে তাঁর ভাবনা অবশ্যই এই যে যারা এটি করতে পারেন, তারা অবশ্যই তা করবেন (দেখুন — সত্যার্থ প্রকাশ, তৃতীয় সমুল্লাস এবং সংস্কৃত বাক্য প্রবোধ)। এই প্রকার প্রস্তুতির জন্য অথবা বৈদিক বিচারানুযায়ী গৃহস্থ হওয়ার জন্য তিনি পিতা-মাতার দ্বারা গর্ভাধান থেকেই প্রস্তুতি আবশ্যক মনে করেন। তিনি শিক্ষা বিষয় শুরু করার সময় একটি ঋষি বাক্য উদ্ধৃত করেছেন — 'মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্যবান্ পুরুষো বেদ' অর্থাৎ মাতা-পিতা ও আচার্যকে ভালো শিক্ষক হতে হবে, তবেই সন্তান উত্তম হবে। সেই সমুল্লাসের আগে প্রথম সমুল্লাসে সর্বোত্তম জ্ঞান পরমেশ্বরের জ্ঞানের বিশদ আলোচনা করেছেন। একশোটি নামের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঈশ্বরের স্বরূপকে যেভাবে গাগরে সাগর ভরা হয়েছে, তা অন্যত্র কোথাও একসাথে পাওয়া হয়তো সম্ভব নয়। এত জ্ঞানী পুরুষের জন্যও প্রথম বিবাহের যোগ্যতা নির্ধারিত করে চতুর্থ সমুল্লাসে ভগবান মনু মহারাজকে উদ্ধৃত করেছেন।

বেদানধীত্য বেদৌ বা বেদম্ বাপি য়থাক্রমম্।
অবিলুপ্ত ব্রহ্মচর্য়ো গৃহস্থাশ্রমমাবিশেৎ।।

অর্থাৎ যিনি পূর্ণ অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালন করেছেন অর্থাৎ স্বপ্নেও যার বীর্য স্খলন হয়নি, এমন পূর্ণ জিতেন্দ্রীয় পুরুষ বা নারী যদি অন্তত একটি, দুটি, তিনটি বা চারটি বেদের যথাযথ অধ্যয়ন না করেন, তবে তার গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের অধিকার নেই।

অর্থাৎ, প্রথমত পূর্ণ জিতেন্দ্রীয় ও পরোপকারী হওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় বিবাহ করা উচিত নয়। আর যদি বিবাহ করেনও, তবে উপরোক্ত যোগ্যতা থাকা অনিবার্য। এই ধরণের গুণসম্পন্ন পিতা-মাতা গর্ভধারণের পূর্বে, মধ্যে এবং পরে শান্তি, আরোগ্য, বল, বুদ্ধি, পরাক্রম ও সুশীলতার মাধ্যমে সভ্যতা প্রাপ্ত করবেন, তেমনি ঘি, দুধ, মিষ্টি ও উন্নত অন্ন পান আদি শ্রেষ্ঠ পদার্থের সেবন করবেন, যাতে রজোবীর্যও দোষমুক্ত ও গুণযুক্ত হয়। এর পূর্বে পঠনকালে অষ্ট মৈথুন

থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা আবশ্যক। এরপর বলবান স্ত্রী ও পুরুষ বিধিপূর্বক গর্ভাধান করবেন এবং গর্ভধারণের পর থেকে এক বছর পর্যন্ত পারস্পরিক শারীরিক সম্পর্ক করবেন না। ঋষির মতে, মানুষকে পূর্ণ ঋতুগামী হতে হবে। এই বিষয়ে পশুরাও আমাদের আদর্শ হতে পারে, যারা ঋতুকাল ছাড়া স্ত্রী পশুর কাছেও যায় না। ঋষির মন্তব্য হল, কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই শারীরিক সম্পর্ক হওয়া উচিত। যখন সন্তানের ইচ্ছা থাকবে না, তখন কখনও শারীরিক সম্পর্ক করা উচিত নয়। মনু-র এই কথার উপর যারা উপহাস করেন যে সর্বাধিক 10 টি সন্তান উৎপন্ন করা উচিত, তারা ভুলে যান যে, যারা ঘৃণ্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সারাজীবন স্বেচ্ছাচারিতার রেকর্ড গড়েছেন, তারা 'আমরা দুই আমাদের দুই' স্লোগানকে আদর্শ মেনে নিজেদের সংযমী মনে করেন। কোনো পশুকে কি কেউ এমন করতে দেখেছেন? তারা সেই মনু-র উপর কী করে ব্যঙ্গ করতে পারেন (যিনি বলেন জীবনে বড়জোর 10 বার শারীরিক সম্পর্ক করবে) ? কোনো মনু-বিরোধী কি এমন সর্বোচ্চ ব্যবস্থা মেনে চলতে পারবেন ? অর্থাৎ, সারা জীবনে মাত্র দশবার শারীরিক সম্পর্ক রাখার মতো সংযম কি কেউ দেখাতে পারবেন ?

এখন আমি নিয়োগ প্রথার বিষয়ে আলোচনা করবো। এতক্ষণ যা লেখা হয়েছে তার মূল ভাব হল, ঋষির মান অত্যন্ত উন্নত স্তরের ছিল। সেই স্তরে চিন্তা করার মতো মস্তিষ্ক ও চিত্ত আজকের শ্রেষ্ঠ মানুষদের মধ্যেই নেই। বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক মিলনের যে উদ্দেশ্য থাকে, নিয়োগের উদ্দেশ্যও ঠিক তাই। তফাত শুধু এটুকুই যে নিয়োগ হল একটি অস্থায়ী এবং আপদকালীন ব্যবস্থা, যেখানে বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু সন্তান উৎপাদনই নয় বরং সমাজকে একটি সুশৃঙ্খল ও শ্রেষ্ঠ রূপ দেওয়া এবং এটি একটি আজীবন স্থায়ী ব্যবস্থা। উভয় ব্যবস্থার উপর সামাজিক অনুমতির মোহর লাগানো বাধ্যতামূলক। এটি ছাড়া উভয় ব্যবস্থাই ব্যভিচারের শ্রেণিতে পড়ে। আমি এখানে এটি প্রমাণ করার জন্য বেদের প্রমাণ দিবো না, কারণ অবৈদিকরা সেটি থেকে কী পাবেন ? আর কিছু বৈদিক ব্যক্তি তার অর্থকেও অপব্যাখ্যা করার ধৃষ্টতাও দেখাতে পারেন। আমি এখানে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণও দিবো না, কারণ বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত দাসরা ব্যাস, বাসুদেব, ইন্দ্র, ধর্মদেব প্রমুখকে ব্যভিচারী বলতে কেন দ্বিধা করবেন ? এই কারণে আমি কেবল সাধারণ যুক্তি ব্যবহার করবো। কার পুনর্বিবাহ হওয়া উচিত আর কার নয়, এই বিষয়টি ইতিপূর্বে সত্যার্থ প্রকাশ-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিয়োগ কখন ও কেন করা উচিত, সেই বৈচারিক পরিপক্কতা ও উচ্চ স্তরে পৌঁছে যখন এটি পড়া হবে, তখনই অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। আমি সত্যার্থ প্রকাশ-এর সমস্ত যুক্তি এখানে

পুনরায় উল্লেখ করে লেখাকে বৃথা বড় করতে চাই না। ঋষি তো ব্যভিচার বা কুকর্ম রোধের উপায় হিসেবে লিখেছেন — ব্যভিচার ও কুকর্ম রোধের এটিই হল একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় , যারা জিতেন্দ্রিয় হয়ে থাকতে পারেন তারা বিবাহ বা নিয়োগ না করলেও চলবে, তো ঠিক আছে কিন্তু যারা তেমনটি পারেন না, তাদের বিবাহ এবং আপদকালে নিয়োগ অবশ্যই হওয়া উচিত। বিধবা বা বিপত্নীকদের সেই আপদকালেই নিয়োগের প্রেরণা দেওয়া হয়েছে, যখন তাদের সন্তানের ইচ্ছা থাকবে অথবা যখন সেই বিধবা বা বিপত্নীক ব্রহ্মচর্য পালন করতে অসমর্থ হবেন। এতে তাদের কামনার ফলও পাওয়া যাবে এবং সন্তানও লাভ হবে। কারণ ঋষি মনে করেন, সন্তানের ইচ্ছা ছাড়া বীজ বৃথা নষ্ট করা ব্যভিচার ও পাপের সমান। তাঁর এই ধারণা ঠিক তেমনি যথার্থ, যেমন কোনো কৃষক সুন্দর বীজকে অনুর্বর জমিতে ছড়িয়ে দেওয়াকে কৃষকের ধর্ম মনে করে আর ফল একটাও পায় না এবং ফল পাওয়ার ইচ্ছাও করে না। এমন কৃষককে মহামূর্খই মনে করা হবে। কিন্তু যারা বীজ ছড়ানোর মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে, তাদের কী বোঝানো হবে? সেই একই দশা তাদের, যারা সম্পূর্ণ জীবন ভোগ তো করতে চায় কিন্তু সন্তান হওয়ার ব্যাপারে এমন ভয় পায়, যেন কোনো ভয়ংকর সাপ স্পর্শ করতে মানুষ ভয় পায়। তারা চরম অপ্রাকৃতিক হওয়া সত্ত্বেও সর্বদাই প্রাকৃতিক ঈশ্বরীয় ব্যবস্থা পালন করাকে পাপ মনে করে এবং নিজেরা সারা জীবন পতি বা পত্নী ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে, তারা নিজেদের সংস্কারবান্ গৃহস্থ মনে করে এবং ঋষিদের পাপী সাব্যস্ত করে। যদি কেউ বলে যে আজকে কোনো ঋষিভক্ত বলে দাবি করা ব্যক্তি কি নিজের পত্নী, কন্যা, ভগিনীকে দিয়ে আপৎকালেও নিয়োগ করাতে চাইবে অথবা কোনো মায়ের সন্তান কি নিজের বড় ভাবি বা ছোট ভাবির সাথে আপৎকালে নিয়োগ করবে? যদি কেউ এমনটা করে তবে নিশ্চিতভাবেই সে মহাপাপী ও দুষ্ট বলে গণ্য হবে এবং আমিও এটি স্বীকার করি যে বর্তমান দেশ, কাল ও পরিস্থিতিতে এমনটা বলাই উপযুক্ত হবে। তখন কেউ বলবে যে তাহলে কেন আমি ঋষি-প্রোক্ত বা বেদোক্ত নিয়োগ ব্যবস্থার ওকালতি করছি? কেন আমি অন্যান্য কিছু আর্যদের মতো চাপা গলায় এটিকে সত্যার্থ প্রকাশ, বেদ বা ভারতীয় ইতিহাসের একটি কলঙ্ক বলে মেনে নিচ্ছি না? না, আমি এমনটা কখনোই করতে পারি না, তবে বর্তমানে এই পরম্পরাকে আমি কোনোভাবেই উচিত মনে করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, নীতিগতভাবে নিয়োগ হল একটি শ্রেষ্ঠ আপদ্ ধর্ম। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে যে আজ কেন এই ধর্মকে অধর্ম বলে বর্তমান সময়ে এমনটা করতে বারণ করা হচ্ছে? এর কারণ আমি বলতে চাইবো। সর্বপ্রথম এটি জেনে নেওয়া উচিত যে কিছু ব্যবস্থা দেশ, কাল ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে যায়,

তা সে যতই শ্রেষ্ঠ ও হিতকারী হোক না কেন? যে কাজ হেমন্ত ঋতুতে করণীয় হতে পারে, সেই কাজই গ্রীষ্ম ঋতুতে অকরণীয় হতে পারে। কোনো কাজ মেরু প্রদেশে করণীয় হলে, সেই কাজই ভূমধ্যরেখীয় উষ্ণ প্রদেশগুলোতে ক্ষতিকর হতে পারে। কোনো কাজ শিশুর জন্য করণীয় হলে, সেই কাজই যুবক ও বৃদ্ধদের জন্য অকরণীয় হতে পারে। এর উদাহরণ দেওয়া আমি প্রয়োজনীয় মনে করি না, কারণ এটি সাধারণত সকল প্রবুদ্ধ পাঠকই জানতে পারেন। প্রাচীনকালে নদীর তীরে, বনে, পর্বতে সন্ধ্যা করা, বনভ্রমণ ও বসবাসকে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর ধর্ম বলা হয়েছে কিন্তু আজ বন আর নেই আর যেখানে আছে সেখানে সেই অসংখ্য বনে কাঁটাঝোপ, জলহীনতা বা দূষিত জলেরই আধিক্য, মশা আদির ঘোর প্রকোপ, কন্দ-মূল-ফলের প্রায় অভাব, আর কোথাও যদি থাকেও তবে বন বিভাগের পাহারা। এমন অবস্থায় ‘গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলা...’ কে ব্যবহার নিয়ে আসা কোনো সহজ কাজ নয় এবং এর প্রয়োজনও নেই, তাই আমাদের এমন বিকল্প খুঁজতে হবে যেখানে সাধনায় বিঘ্ন না ঘটে এবং বনের মতো শান্তি, সরলতা, প্রাকৃতিক জীবন ঘরে বা আশ্রমেই উপলব্ধ হবে। যে কালে এটি লেখা হয়েছিল, সেই কালে প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক ব্যবস্থা এবং রাজধর্মও তারই অনুকূল ছিল। রাম রাজ্যে মশা, সাপ আদির ভয় ছিল না। তখন যেকোনো স্থানে বসেই নির্বিঘ্নে সাধনা করা যেত। আজ তো বন্ধ ঘরে বসেও মশারি ও পাখা প্রয়োজন, তবে ঘোর জঙ্গলে কীভাবে সাধনা হবে? তাই আমাদের পুরাকালের কিছু শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাকে তৎকালে সম্পূর্ণ হিতকর মনে করলেও বর্তমান প্রতিকূল কালে তাকে উচিত মনে করা ঠিক নয়। যখন ভারতে নিয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই সময়ের মানুষ সুশৃঙ্খল ও সংযত অবস্থায় থাকতো। তারা কামশক্তিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কামুক ছিল না। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর মিলন কেবল সন্তান উৎপত্তির জন্যই করতো, তা নিয়োগ হোক বা বিবাহ। যখন উদ্দেশ্য সফল হতো, তখন তাদের মধ্যে আর কোনো শারীরিক সম্পর্কের আকাঙ্ক্ষা থাকতো না। তখন তারা নিশ্চিতভাবেই নিয়োগ করার বা করানোর অধিকারী ছিল। কিন্তু আজ যখন মানুষ কামুকতায় জগতের অধম প্রাণীদেরও পেছনে ফেলে দিয়েছে, যারা বৃথা বীর্যপাতে আনন্দ পায় এবং যার জন্য বীজের প্রয়োগ হওয়া উচিত, তাকে ভয় পায়। যেখানে স্বয়ং মা সর্পিনী সেজে বা ক্ষুধার্ত কুকুরী সেজে নিজেরই ভ্রূণকে খেয়ে ফেলে অর্থাৎ গর্ভপাত করিয়ে পাপী হয়ে যায়, সেখানে কোনো কোনো পরিবার পরিকল্পনার নামে স্বেচ্ছাচারী হয়ে প্রতিদিন ভোগবিলাসে লিপ্ত থাকে। তারা কীভাবে নিয়োগ প্রথার ওপর আঙুল তোলার অধিকারী হতে পারে এবং তারা তো নিয়োগ প্রথা করানোরও যোগ্য নয়।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যারা সত্যার্থ প্রকাশ-এর ভূমিকা থেকে শুরু করে তৃতীয় সমুল্লাস এবং চতুর্থ সমুল্লাসের অর্ধেক পর্যন্ত মহর্ষির উজ্জ্বল আদর্শগুলোকে জীবনের শতাংশ ভাগও পালন করার যোগ্যতা রাখে না, তারাই সরাসরি নিয়োগ প্রথা নিয়ে শোরগোল শুরু করে। আরে! আগে তো এটা পড়ে দেখো যে ঋষি জিতেন্দ্রিয়তাকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন? তিনি বিবাহিতদেরও কেমন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন? যদি ঋষির কথা মেনে চলা হয়, তবে গৃহস্থ হওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়বে, তখন নিয়োগ করবে কে বা করাবেই বা কে? এই কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে ঋষি অনুমোদিত গৃহস্থের জন্য খুব কম লোকই যোগ্য বলে গণ্য হবে। নিয়োগের যোগ্যতা তো এর চেয়েও অনেক বেশি। তবে কেন নিয়োগ নিয়ে আলোচনা করতে আসো? ভালো হয় যদি নিজের ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখো, তারপর কাদা ছোড়াছুড়ি করো। আচ্ছা, যে ব্যক্তি শরীর শাস্ত্রের ক, খ, গ-ও জানে না, একজন যোগ্য সার্জন দ্বারা করা অস্ত্রোপচারের উপর সেই ব্যক্তির চিৎকার করার কী অধিকারটা আছে? আরে! আগে অস্ত্রোপচারের প্রাথমিক জ্ঞান তো অর্জন করো, তারপর ভাবো যে সার্জনের করা এই কাটা-ছেঁড়া হিংসা নয় বরং প্রকৃত অহিংসা। একইভাবে, যারা অত্যন্ত জিতেন্দ্রিয় যোগী পুরুষ বা নারী হন, তারাই নিয়োগ করার যোগ্যতা রাখেন এবং তারাই এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করতে পারেন। নীতিগতভাবে: বিচার প্রতিটি প্রবুদ্ধ নিরপেক্ষ ব্যক্তি করতে পারেন, যিনি হয়তো পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় নন কিন্তু ইন্দ্রিয়াসক্তিকে পাপ বলে মনে করেন। ইন্দ্রিয়াসক্তিকে স্বাভাবিক মনে করা ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে এই কথা সাত জন্মেও ঢুকবে না যে নিয়োগ ভালো, তারা তো একে খারাপ বলছে কারণ সমাজ আজ একে খারাপ বলে। এই সমাজে কী কী পাপ প্রকাশ্যে বা গোপনে ঘটছে, সেদিকে না সমাজ নজর দিচ্ছে আর না যারা অভিযোগ তুলছে তারা। আজ নিয়োগই নয় বরং এমন অনেক বৈদিক ব্যবস্থা আছে যা যে কোনো নিরপেক্ষ সত্যপথযাত্রী ব্যক্তির কাছে সঠিক বলে মনে হবে কিন্তু বর্তমান সময়ে তা করা সম্ভব নয়। যেমন বেদে বলা হয়েছে যে যদি কেউ আমাদের গরু, ঘোড়া বা মানুষকে মারে, তবে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা উচিত। যদিও এই আদেশ সম্পূর্ণ সঠিক ও হিতকর, কিন্তু আজকের সামাজিক ও রাজব্যবস্থা একে করতে দেবে না। হাজার হাজার নির্দোষ প্রাণীর হত্যাকারীকে দণ্ডদানকারী বীর পুরুষকেও ঠিক একইভাবে জেলে বন্দি করে দেওয়া হবে, যেভাবে অন্য কোনো খুনিকে বন্দি করা হয়। তবে এ কেমন অন্ধ আইন? এই অন্ধ আইন থাকা সত্ত্বেও আজ বেদের যথাযথ ও উত্তম আদেশ কীভাবে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে? তবে কি দোষ বেদাদেশকে দেওয়া হবে? নাকি সেই উত্তম ব্যবস্থাকে সরিয়ে আজ যে

পাপপূর্ণ তথাকথিত সাম্যের আচরণের দম্ভ আইন ব্যবস্থা করছে, তাকে দেওয়া হবে — এটি পাঠক নিজেই বিচার করুন। যদি এই ব্যবস্থা এখন প্রয়োগ করা হয়, তবে পারস্পরিক রক্তপাত শুরু হয়ে যাবে। যার শক্তি আছে, সে সুযোগ পেলেই দুর্বলকে আঘাত করতে থাকবে। আজ পাপীকে গুলি করার মতো সাহস রাখার মানুষও বিরল। বৈদিক আর্য ব্যবস্থা এমনও ছিল যে, যে ধনী দান করে না এবং যে দরিদ্র তপস্যা করে না, সেই উভয়কেই মেরে ফেলা উচিত। (দেখুন বিদুর নীতি)। আজ যদি এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়, তবে ভয়ানক রক্তপাত হবে, কারণ আজ তো দানপ্রার্থী অর্থলোভীদেরও এক জাল বিছানো আছে, যারা জোরপূর্বক দান চাইবে এবং না দিলে বিদুর জীর প্রমাণ দিয়ে দাতাকেই মেরে ফেলবে। একইভাবে, ক্ষুধার্ত ও শোষিত ভিক্ষার্থী ব্যক্তিকে রক্তচোষা ধনী তপস্যা করার উপদেশ দেবে, নতুবা তাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হবে। এই কারণেই বর্তমান সময়ে এই ব্যবস্থা যথাযথ নয়, কারণ আজ না আছে তপস্বী ভিক্ষার্থী, আর না আছে পরোপকারী ধনী ব্যক্তি। তাই আজ বৈদিক যুগের সর্বোত্তম অথচ এই ধরণের কঠোর বা আপদ্ধর্মের ব্যবস্থাগুলোকে অকস্মাৎ গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই, বরং সমগ্র পরিবেশকে বেদানুকূল করে তোলা প্রয়োজন। তার পরেই সেই ব্যবস্থাগুলো প্রয়োগ করা যেতে পারে, অন্যথায় যোগ্য ব্যক্তিরও নিয়োগ-এর অধিকার থাকা উচিত নয়। কারণ যদিও সে যথাযথ কাজ করছে, তবুও অনধিকারী ব্যক্তিরা তার মান না বুঝে নিজেরাই সন্তানের জন্য নয়, বরং ব্যভিচারে লিপ্ত হতে পারে, যার ফলে সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়তে পারে। তবে হ্যাঁ, যদি কখনও বৈদিক সাম্রাজ্য বা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে পুনরায় সেই সমস্ত নিয়ম সহজেই কার্যকর হতে পারে। তবে এটুকু মনে রাখা প্রয়োজন যে, তখনও নিয়োগ সাধারণ ধর্ম না হয়ে আপদ্ধর্ম হিসেবেই গণ্য হবে, যেখানে বিবাহই সর্বদা সাধারণ ধর্ম হয়ে থাকবে।

* * * * *

পথভ্রষ্টদের দম্ভ

(অগাস্ট ২০০২-এ লেখা নিবন্ধ)

আর্য সমাজের বিশিষ্ট বিদ্বান শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভবানীলাল জী ভারতীয় কর্তৃক প্রেরিত ‘আর্য জগৎ’ সাপ্তাহিকের 2 জুন 2002 সংখ্যায় প্রকাশিত এক তথাকথিত প্রবুদ্ধ লেখিকা ডাঃ বন্দিতা আরোরা দ্বারা লিখিত নিবন্ধ ‘শুদ্ধ আর্যসমাজ ও প্রবুদ্ধ আর্যসমাজ’ গতকালই পড়লাম। এটা দেখে হৃদয়ে গভীর আঘাত লেগেছে যে, কীভাবে আর্য নামধারী অনার্যদের দ্বারা প্রকাশিত এবং নিজেকে প্রবুদ্ধ দাবি করা এক অনার্য লেখিকা আর্য সমাজের আদর্শের ওপর আঘাত হেনেছেন। যাইহোক, যবে থেকে শ্রী উদয়বীর এই পত্রিকার সম্পাদক হয়েছেন, তবে থেকে তিনি নিরন্তর অনার্যতার ধারা প্রবাহিত করে যে পাত্রে খাচ্ছেন, তাতেই ছিদ্র করার পাপ করছেন। হে দয়ানন্দ ঋষির নামে ভিক্ষা চেয়ে জীবন ধারণকারীরা! আর্য সমাজের নামে পেট পালনকারীরা ডি.এ.ভি.-র নামে তৈরি রাজকীয় ভবনে বসে থাকা ঐশ্বর্যশালীরা! এই চরম অকৃতজ্ঞতার পাপে আপনাদের ভয় লাগে না? ‘আর্য জগৎ’-এর 7 জুলাই 2002 সংখ্যার কোনো পাঠকের প্রতিক্রিয়ার ওপর মন্তব্যকারী উদয়বীর জী বা আরোরা মহোদয়া! যদি আপনার এবং আপনাদের স্বয়ম্ভু প্রবুদ্ধ মণ্ডলীর আর্য প্রাদেশিক সভায় সাহস থাকে, তবে আর্য সিদ্ধান্তের সতত সজাগ প্রহরী ‘দয়ানন্দ সন্দেশ’-এর জুলাই 2002 সংখ্যায় আপনাদের সাথে শাস্ত্রার্থের আহ্বান জানানো আমাদের আর্য বিদ্বান শ্রী প্রো. রাজেন্দ্র জী জিজ্ঞাসু এবং শ্রী ডাঃ জ্বলন্ত কুমার জী শাস্ত্রীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন। এর পাশাপাশি আমার এই লেখাকেও আপনাদের আর্যজগৎ-এ প্রকাশিত করার এবং তার খণ্ডন করার সাহস দেখান। আমি আমার এই লেখার মাধ্যমে সমস্ত আর্য জগতকে এই বার্তা দিতে চাইবো যে আপনাদের সুষুপ্তি বা মরণাবস্থা, কাপুরুষতা এবং নপুংসকতার কারণেই আর্যত্বের চতুর্দিক থেকে হত্যা করা হচ্ছে। শিখদের ভয়ে লেজ গুটিয়ে পলায়নকারীরা (যেমনটা শাস্ত্রার্থের আহ্বান থেকে প্রকাশ পাচ্ছে) অনার্য লোক আপনাদের প্রমাদী, ভীতু এবং স্বাধ্যায়হীন মনে করেই নির্লজ্জভাবে অনর্গল প্রলাপ বকছে। আমি অনেকদিন ধরেই আর্য জগতের এই কার্যকলাপ দেখছিলাম, কিন্তু এখন এদের অকৃতজ্ঞতার কোনো সীমা দেখতে না পেয়ে, নিজের ধৈর্যের সীমা শেষ করে আমি এদের এই চ্যালেঞ্জিং উত্তর দিচ্ছি। আমি তথাকথিত প্রবুদ্ধ ব্যক্তিদের বলছি যে — আসুন, দেখা যাক কে প্রকৃত জ্ঞানী আর কেই বা বুদ্ধ (মূর্খ)?

পরোপকারিণী সভার মান্য প্রধান শ্রী গজানন্দ জী আর্যের লেখা নিবন্ধটিও ‘আর্য জগৎ’-এর এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছে। এই নিবন্ধের খণ্ডন করতে গিয়ে লেখিকা অহেতুক কলম

ঘষেছেন। ওহ মহোদয়া! শ্রী আর্য জী এমন কী আপত্তিকর লিখে ফেলেছেন যা আপনি সহ্য করতে পারলেন না ? আজ আর্যত্বের ওপর আঘাত হানার মতো রাক্ষসী প্রবৃত্তির অনেক মানুষ আছে; আপনারা দয়া করে ধৈর্য ধরুন। আমি শ্রী গজানন্দ জী আর্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে আপনার নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিচ্ছি। আপনি নিজের বুদ্ধির সাথে এটি মিলিয়ে দেখে নেবেন।

ডাঃ অরোরা নিবন্ধে প্রবুদ্ধ এবং শুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে নিজের পাণ্ডিত্যের ভণ্ডামি প্রদর্শন করেছেন। মনে হচ্ছে লেখিকার এইটুকুও বুদ্ধি নেই যে তিনি ‘শুদ্ধ’ এবং ‘প্রবুদ্ধ’ শব্দের অর্থ বুঝতে পারেন। তবুও তিনি নিজেকে প্রবুদ্ধ বলে দাবি করছেন ? ‘শুদ্ধ’ শব্দের অর্থ হল — পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ, বিমল আদি। এই শুদ্ধতার প্রতি তথাকথিত প্রবুদ্ধদের দ্বেষ আছে অর্থাৎ তারা অশুদ্ধতাকেই প্রবুদ্ধত্বের লক্ষণ বলে মনে করছেন; যার অর্থ তাদের প্রবুদ্ধত্ব অপবিত্র, কলঙ্কিত, দোষী ও মলে পরিপূর্ণ। তাহলে ডাঃ অরোরার আর্যত্ব কেমন ছিল, তা তিনিই ভালো জানেন। ‘প্রবুদ্ধ’ শব্দের অর্থ হল — জেগে ওঠা, বুদ্ধিমান, চতুর। কেউ কি অপবিত্র ও মলে পরিপূর্ণ হয়েও বুদ্ধিমান হিসেবে গণ্য হবে ? তবে হ্যাঁ, কিছু মানুষ এমনও হয় যারা জেগে তো থাকে এবং বুদ্ধিমানও হয়, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধিতে তারা এক নম্বর চতুর এবং আচরণে নোংরা, দোষ ও কলঙ্কে ভরা থাকে। এমন শুদ্ধতা-বিদ্বেষী, বিরোধী প্রবুদ্ধতা কি আপনার ? যদি তাই হয়, তবে দয়া করে এই প্রবুদ্ধতা নিজের কাছেই সামলে রাখুন। আমার মতো নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র, সর্বতোভাবে নির্দোষ ও বিমল আর্যত্বের মূর্তি—ঋষি দয়ানন্দের ভক্ত ও বেদানুরাগী ব্যক্তি আপনার চালাক ও ছদ্ম-বুদ্ধি থেকে দূরে থাকাই ভালো। আরও একটি কথা বলে রাখি যে, আপনার ‘প্রবুদ্ধ’ শব্দের অর্থও জানা নেই, না হলে আপনি প্রবুদ্ধতা ও শুদ্ধতার মধ্যে পার্থক্য দেখাতেন না। আসলে যে প্রবুদ্ধ অর্থাৎ যে জেগে গেছে, বুদ্ধিমান আছে, সে শুদ্ধতাকেই বরণ করবে। কোনো বুদ্ধিমান কি অশুদ্ধি, মলাদি বিকার সেবন করতে চাইবে ? কখনোই না। সে শুদ্ধ আচরণ, শুদ্ধ ভোজন এবং শুদ্ধ বিচারই গ্রহণ করবে; অন্যথায় সে প্রবুদ্ধ নামধারী এমন এক ধূর্ত ও মূর্খ হিসেবে পরিচিত হবে, যে মদিরা ও ধূমপান আদিকে ক্ষতিকারক জেনেও সেবন করে এবং নিজের শরীর, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিনাশ ঘটায়। বলুন মহাশয়! আপনার প্রবুদ্ধতা কি এই রকমই ? মহাশয়া! আপনার ‘আর্য’ শব্দের অর্থও জানা নেই। মনে রাখবেন — প্রকৃত (স্বাভাবিকভাবে শুদ্ধ) আচরণকারী ব্যক্তিই ‘আর্য’ নামে পরিচিত। ঈশ্বরপুত্র অর্থাৎ ঈশ্বরীয় মর্যাদা পালনকারী এবং সত্যজ্ঞানের সাথে সেই অনুযায়ী কাজ বা আচরণ করে যা প্রাপ্তব্য তা পাওয়ার চেষ্টা করাই হল আর্য। এইভাবে যিনি শুদ্ধ হবেন, তিনিই আর্য হবেন এবং তিনিই প্রবুদ্ধ হবেন, কর্মঠ হবেন এবং

নিজের লক্ষ্য অর্জনে সফলও তিনিই হবেন। তাই প্রথমে আপনি আপনার শিরোনামটি শুদ্ধ করুন, তারপরই কলম ধরুন। কিন্তু যে পবিত্রতাকেই ঘৃণা করে, সে কেনই বা শিরোনাম শুদ্ধ করে লিখবে ? আপনার শিরোনাম আসলে 'শুদ্ধ আর্য সমাজ এবং ছদ্মবেশী আর্য সমাজ' হওয়া উচিত ছিল। অস্তু!

এখন আপনার বোধশক্তির পরীক্ষা করা যাক —

এটা ঠিক যে ঋষি দয়ানন্দের নিজস্ব কোনো নতুন মত প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না, তবে তাঁর উদ্দেশ্য এমনও ছিল না যে আজকের পাশ্চাত্য ভোগবাদী পাশবিক সভ্যতার দাস হয়ে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে যা খুশি তা-ই মানা ও প্রচার করা হবে। ঋষির আধা-অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি দিয়ে লেখিকা পাঠকদের সাথে প্রতারণা করার চেষ্টা করেছেন। ঋষি নিজের মতবাদ সম্পর্কে বলেছেন —

"যা বেদাদি সত্যশাস্ত্র এবং ব্রহ্মা থেকে জৈমিনি মুনি পর্যন্ত স্বীকৃত ঈশ্বর আদি পদার্থ আছে, যা আমি বিশ্বাস করি, আমি তা সকল সজ্জন ব্যক্তিদের সামনে প্রকাশ করছি। আমি তাকেই আমার সিদ্ধান্ত বলে মানি যা তিন কালেই এক সমান এবং সবার সামনে মানার যোগ্য।"

ঋষি দয়ানন্দ বেদ এবং ব্রহ্মা থেকে জৈমিনি মুনি পর্যন্ত সিদ্ধান্তগুলো মেনে চলার পরামর্শ দেন, নিজের ইচ্ছামতো যা খুশি তা মানার জন্য নয়। তবে হ্যাঁ, আপনি এবং আপনার জ্ঞানীরা অনেক দুনিয়া দেখেছেন, তারা যা খুশি তা বিশ্বাস করতে পারেন। আপনার লেখা হল —
''দয়ানন্দী হওয়ার অর্থ কী ? আমরা দয়ানন্দকে আমাদের গুরু মানি, পূজ্য মানি। তিনি যোগী ছিলেন, ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। তিনি যা কিছু লিখে গেছেন, তা পরম সত্য।'' এটি আপনি কটাক্ষ করে লিখেছেন। আপনি সত্যার্থ প্রকাশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার তুলনা মুসলমান ও খ্রিস্টানদের কুরআন ও বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে করেছেন। আপনি লিখেছেন — ''তাদের (প্রবুদ্ধ আর্য সমাজীদের) মতে সত্যার্থ প্রকাশ অনেক ত্রুটিপূর্ণ রচনা, যা যথাযথ সংশোধনের পরেই গ্রহণ করা সম্ভব।''

সমীক্ষা — আপনি দয়ানন্দকে গুরু মানেন না। আপনার কি 'গুরু' শব্দের অর্থও জানা আছে ? নাকি বিদ্বেষবশত এমনটা লিখেছেন ? ভগবান মনু 'গুরু'র সাধারণ লক্ষণ লিখেছেন —

অল্পম্ বা বহু বা য়স্য শ্রুতস্যোপকরোতি য়ঃ।
তমপীহ গুরুম্ বিদ্যাত্ শ্রুতোপক্রিয়য়া তয়া।। (মনুস্মৃতি 2.124)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাউকে কোনো বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সামান্য বা অধিক উপকার করেন, এই সংসারে সেই বিদ্যা দানের কারণে তাকে গুরু বলে গণ্য করা উচিত।

আচার্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভগবান মনু বলেছেন —

উপনীয় তু য়ঃ শিষ্যম্ বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ।

সকল্পম্ সরহস্যম্ চ তমাচার্যম্ প্রচক্ষতে।। (মনুস্মৃতি 2.115)

অর্থাৎ, যিনি যজ্ঞোপবীত সংস্কার করিয়ে কল্পসূত্র ও বেদান্তসহ শিষ্যকে বেদ শিক্ষা দেন, তাকে আচার্য বলা হয়।

এটা ঠিক যে ঋষি দয়ানন্দের মুখ থেকে আমরা সরাসরি কিছু শিখিনি, কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলী এবং তাঁর তপস্যা ও বলিদানের ফলেই আজ আমরা কিছু পড়ার বা শোনার অধিকার পেয়েছি। আপনি যে নারী জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই নারীদের নরকের দ্বার থেকে উদ্ধার করে স্বর্গের পথ দেখানো, পায়ের জুতো থেকে সরিয়ে মাথার তাজ বানানো, ঢোল ও অজ্ঞ মতো তাড়না থেকে বাঁচিয়ে ঘরের সম্রাজ্ঞী বানানো এবং বেদ পাঠ ও উচ্চপদে পৌঁছে দেওয়ার কাজ সেই গুরু বা আচার্য দয়ানন্দ করেছে, যিনি আমাদের ও আপনাদের জন্য বিষ পান করেছেন, লাঠি ও তলোয়ারের আঘাত সহ্য করেছেন, জঙ্গল ও বরফে ঢাকা পাহাড়ে ঘুরে বেরিয়েছেন। কিন্তু হায়! অকৃতজ্ঞ তথাকথিত প্রবুদ্ধ আর্যদের অধিবক্তা ডাঃ অরোরা জী! আপনি সেই দেব দয়ানন্দকে আমাদের দ্বারা পূজ্য, গুরু, যোগী ও ব্রহ্মজ্ঞানী বলে মেনে নেওয়াকে নির্লজ্জভাবে উপহাস করছেন। মনে রাখবেন — 'কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ' (বাল্মীকি রামায়ণ) অর্থাৎ অকৃতজ্ঞের কোনো নিষ্কৃতি নেই। ঋষিবর আমাদের ওপর সামান্য নয়, বরং অকল্পনীয় উপকার করেছেন এবং আপনার ওপর তো আমাদের চেয়েও অনেক বেশি। এই কারণেই দয়ানন্দ আমাদের ও আপনাদের গুরু, আচার্য এবং কেবল পূজ্যই নন, পরম পূজ্য। আপনার মতো মানুষ যোগ বা ব্রহ্মজ্ঞান কী তা জানবে কী করে, যারা তাঁর যোগী ও ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। আপনি প্রতিটি বিষয়ে নিজের বুদ্ধিতে ভাবার ওকালতি করেন। কিন্তু মহোদয়া! আপনার লেখা থেকে বুদ্ধির বিন্দুমাত্র প্রতিফলনও দেখা যাচ্ছে না। সংসারে কে নিজেকে প্রবুদ্ধ দাবি করে কেবল নিজের বুদ্ধির ওপর ভরসা করে বেঁচে থাকতে পারে? এমন কে আছে যে পৃথিবীকে গোল ও ঘূর্ণায়মান বলে মানে না? কে সূর্যকে পৃথিবীর চেয়ে বড় বলে মানে না? কে এটমের গঠনকে প্রমাণ হিসেবে মানে না? কে চিকিৎসকের জ্ঞানের ওপর বিশ্বাস করে না? আপনার প্রবুদ্ধত্ব কি এমনটা করে না? আমি জিজ্ঞাসা করছি, আপনি বা আপনার প্রবুদ্ধ ব্যক্তিরা কি পৃথিবীর আকার

ও গতি স্বপ্নে দেখেছেন ? সূর্যের আকার মেপেছেন ? এটমের গঠন দেখেছেন ? যদি না দেখে থাকেন, তবে নিজের বুদ্ধিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সংকল্প কোথায় গেল ? কেন আপনি গবেষকদের প্রমাণ হিসেবে মেনে নিলেন ? তবে কেন আমরা ঋষি দয়ানন্দ বা ঋষিদের কথা প্রমাণ হিসেবে মানবো না ? কেন আমরা প্রতিটি বিষয়ে সন্দেহ করবো ? মনে রাখবেন, আপনি যেভাবে এই প্রমাণগুলোর সাথে নিজের বুদ্ধি দিয়ে ভাবেন, আমরাও তেমনি বুদ্ধি রাখি।

আপনি দুনিয়া দেখার দম্ভ করছেন। শুনুন, দুনিয়া তো ট্রেনে ঘুরে বেড়ানো ভিখারিরা সবচেয়ে বেশি দেখেছে। তারা প্রতিদিন আপনার মতো হাজার হাজার মানুষকে দেখে, তবে তারা কি আপনার কাছে মহৎ ব্যক্তি হয়ে যাবে ? এটা ঠিক যে 'সত্যার্থ প্রকাশ' বেদ নয়, তবে এটি হল বেদের প্রবেশদ্বার। ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা, দর্শন, উপনিষদ, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, অন্যান্য বেদাঙ্গ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলো না বুঝে বেদে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। সত্যার্থ প্রকাশ-কে পন্ডিত গুরুদত্তের মতো বিজ্ঞানী রত্নের খনি মনে করতেন, কিন্তু আপনার মেধা বলবো নাকি ঋতম্ভরা (?) তাকে ভুলত্রুটির ঝুলি বলছে। হিরের মূল্য তো জহুরিই বোঝে, অজ্ঞানী তো তাকে পাথর ভেবে গুলতিতে রেখে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। আপনার অবস্থাও ঠিক তেমনি হয়েছে। কোথাও মুদ্রণ জনিত ত্রুটি থাকতে পারে, সেগুলোও বেদ-বেদাঙ্গ-উপাঙ্গের গভীর জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বানরাই বুঝতে পারেন। ডি.এ.ভি. বা প্রাদেশিক সভার ম্যাকালে মানসপুত্রদের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। আপনি বিশ্বকে কবে থেকে দেখেছেন, তা-ও আপনার লেখা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আপনি লিখেছেন — ''আর্য প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভার 107 তম বার্ষিক রিপোর্টের প্রস্তাবনায় সভা মন্ত্রী শ্রী প্রবোধ মহাজন লিখেছেন — 'এমন কোটি-কোটি মানুষ আছেন, যারা আর্য সমাজের সদস্য না হয়েও আর্য সমাজের আদর্শে বিশ্বাস করেন।' এটি চোখ খুলে দেওয়ার মতো একটি বাক্য।'' এতে প্রমাণিত হয় যে প্রবোধ মহাজন জীর এই কথনের মাধ্যমে আপনার চোখ খুলে গেছে, তার আগে পর্যন্ত চোখ বন্ধ রেখেই সব কাজ চলছিল। কিন্তু আমাদের চোখ তো দিব্য দয়ানন্দ, তাঁর অমর গ্রন্থসমূহ, পণ্ডিত গুরুদত্ত, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পণ্ডিত লেখরাম, মহাত্মা হংসরাজ, স্বামী দর্শানন্দের মতো তপস্বী ও আত্মত্যাগীদের দ্বারা অনেক আগেই খুলে দিয়েছিল, তবুও আপনি দুনিয়াকে আমাদের চেয়ে বেশি দেখে ফেলেছেন! প্রবোধ জী এমন কী বেদ বাক্য থেকে বড় মহাবাক্য বলে দিলেন, যেন সৃষ্টির প্রথম সূর্যোদয় হয়ে গেল ? তাহলে পুরো রিপোর্টকে তো কোনো উপমাই দেওয়া যেতে পারে না। আহা! আপনার দৃষ্টিতে তো ডুমুরই ডুমুরফল হয়ে গেল বা চীনাবাদাম নিজেকে কাঠবাদাম ভেবে অহংকার করতে লাগল। অস্পৃশ্যতা, উঁচু-নিচু,

যৌতুক প্রথা আদির নির্মূল, নারী সম্মান আদি পর্যন্তই আপনার মতো প্রবুদ্ধদের আর্য সমাজ সীমাত। আর্যত্বের যে পরিভাষা আমি পূর্বে লিখেছি, তা আপনার প্রবুদ্ধরা কী বুঝবেন ? আপনি বলতে চান যে কোটি-কোটি মানুষ নিজেদের আর্য সমাজী বলে পরিচয় দিতে চান না। এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক কারণ সত্যের রক্ষক, জ্ঞাতা ও প্রচারক পৃথিবীতে সর্বদাই কম হয়। মহাপুরুষ কদাচিৎ জন্ম নেন। মহাপুরুষ এবং সৎ মানুষদের ভিড় কখনো হয় না। ভিড় হয় চোর, অসাধু, মদ্যপ এবং মাংসাশীদের, যারা আছেও। আর্য সমাজের শেকড় শুকিয়ে যাচ্ছে, এটি সত্য এবং এটি আমাদের চিন্তার বিষয়ও বটে। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাইবো যে এই দোষ আমাদের নিজেদের, দয়ানন্দ অনুসারীদের এবং আপনার মতো তথাকথিত প্রবুদ্ধদের; এই দোষ না দয়ানন্দ জীর আর না বৈদিক সিদ্ধান্তের। ঋষি ভক্তদের 'দয়ানন্দী' বলে উপহাসকারী মাননীয়া লেখিকা! আমরা তো দয়ানন্দী, ব্রহ্মা ঋষি থেকে শুরু করে জৈমিনী মুনি পর্যন্ত সকলের ভক্ত হলাম আমরা এবং এতে আমরা গর্বিত। কিন্তু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে আপনি কে ? আপনি কি মূর্তিপূজার প্রশংসা করা আদি শঙ্করাচার্যের ভক্ত নাকি বর্তমানের নকল শঙ্করাচার্যদের ভক্ত, যারা আপনাকে নরকের দ্বার বলেন বা বলছেন ? নাকি আপনি বাবা তুলসীদাসের ভক্ত, যিনি আপনাকে ঢোল, গঁওয়ারের (মূর্খ) মতো তাড়নার যোগ্য বলে গেছেন ? নাকি আপনি খ্রিস্টান বা মুসলমানদের ভক্ত, যারা নারীর মধ্যে আত্মা আছে বলেই মানে না বা তাদের কৃষি জমির সমান মনে করে? নাকি আপনি আমেরিকা ও ইউরোপের কু-সভ্যতার ভক্ত, যারা নারীকে কেবল ভোগের বস্তু মনে করে সমান অধিকারের দোহাই দেয় ? বলুন তো দেখি, আপনি কে ? আপনি লিখেছেন —

''এই লোকেরা আর্য সমাজের তুলনায় পিছিয়ে নেই। জ্ঞান, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান এদের অনেক আছে। তারা উচ্চপদস্থ এবং প্রভাবশালীও বটে।''

সমীক্ষা — এর অর্থ হল আপনি আর্যদের পিছিয়ে পড়া মনে করেন। ঋষির বেদ ভাষ্য পড়ে দেখুন, তবে জানতে পারবেন যে বেদের বিদ্যা ও আদর্শ উভয়ই আধুনিক বিদ্যা ও আদর্শের চেয়ে উন্নত। যে সময় বায়ুযান আদি অনেক শিল্পবিদ্যার কেউ কল্পনাও করতে পারতো না, সেই সময় ঋষি নিজের বেদ ভাষ্যে অনেক বিদ্যার প্রকাশ করেছিলেন। যদি কেউ এমন বলে যে দয়ানন্দীরা কী করেছে তাহলে তার দোষ প্রকৃত দয়ানন্দী হতে না পারা হবে; এর জন্য দয়ানন্দ বা দয়ানন্দী হওয়াকে দোষ দেওয়া যায় না। এর কারণ এটিও যে, রাজকোষের সমস্ত অর্থ তো নকল প্রবুদ্ধ আর্য বা অন্য লোকেরা ভোগ করছে; আমাদের কাছে আছেই বা কী, যা দিয়ে

কোনো বিশেষ কাজ হতে পারে। তবুও আমরা বিজ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে আমাদের গুরু দয়ানন্দের ওপর আইনস্টাইনের প্রতিভাকে উৎসর্গ করতে পারি। আপনি দয়ানন্দকে পড়ে দেখুন, তবে জানতে পারবেন যে আজ কেউ পদার্থবিদ, কেউ রসায়নবিদ, কেউ গণিতবিদ, কেউ ভূগোলবিদ, কেউ অর্থনীতিবিদ, কেউ পরিবেশবিদ, ইতিহাসবিদ, রাজনীতিবিদ বা সমাজবিজ্ঞানী — যে কোনো একজন হতে পারেন; কিন্তু আমাদের গুরু দয়ানন্দ ছিলেন 'একস্মিন্নেব সর্বে' অর্থাৎ 'অল ইন ওয়ান' এবং কেবল তাই নয়, বরং এর বাইরেও আমাদের গুরু শুধু য়োগীই ছিলেন না, বরং ছিলেন মহায়োগী, ব্রহ্মজ্ঞানী, শরীরে মহাবলী, আত্মা থেকে মহাত্মা, মর্যাদায় শ্রীরাম, বক্তৃত্ব কলা ও নীতিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ, যৌক্তিকতায় আচার্য শঙ্কর, ত্যাগে বুদ্ধ, তপস্যায় মহাবীর, প্রেমে যিশু, ভ্রাতৃত্ববোধে মুহম্মদ, দেশভক্তিতে প্রতাপ, কূটনীতিতে শিবা, ভক্তিতে কবির, দাদূ ও তুলসী ছিলেন, ব্রহ্মচর্য ব্রতে ভীষ্ম এবং হনুমান ছিলেন। সেই মহাপুরুষের জীবন চরিত্র ও শাস্ত্রাধ্যয়নের সাথে আপনার তথাকথিত প্রবুদ্ধদের কি তুলনা হতে পারেন ? [1]

আপনার বক্তব্য হল — **''তাদের (প্রবুদ্ধ আর্যদের) দৃষ্টিতে হিন্দ, হিন্দী ও হিন্দু ততটাই গ্রহণযোগ্য, যতটা আর্যাবর্ত, আর্য ভাষা এবং আর্য।''**

সমীক্ষা — এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই কারণ আপনার প্রবুদ্ধদের বুদ্ধি এতটুকুই আছে। তাদের না আছে ইতিহাসের জ্ঞান আর না আছে বৈদিক বা ভারতীয় সংস্কৃতির জ্ঞান। পাশ্চাত্যের উচ্ছিষ্টভোগী হয়ে অহংকার পীড়িত আছেন অবশ্য। একটু বলুন তো আপনার হিন্দ, হিন্দী ও হিন্দু শব্দগুলোর প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে কোথায় উল্লেখ আছে ? যদি আপনাকে নিজের ও নিজের দেশের নাম দেখার জন্য ইরানি গ্রন্থ আবেস্তা বা অন্য বিদেশী সাহিত্য খুঁজতে হয় অথবা নিজের নতুন গ্রন্থগুলোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, তবে এটি লজ্জার বিষয় নয় কি ? আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি নিজের ও নিজের দেশের নামও জানতেন না ? আশ্চর্যের বিষয় হল, নামের জন্যও বিদেশের প্রমাণের ওপর নির্ভর করা লোকেরাও নিজেদের স্বদেশ ভক্ত বলেন ? তবুও আমি বর্তমান পরিস্থিতিতে নামের এই বিবাদকে খুব প্রয়োজনীয় মনে করি না, কিন্তু কেউ সত্যের গলা টিপে অসত্য প্রতিষ্ঠা করলে বা সত্যকে অসত্যের সমান স্থান দিলে অথবা বেদ, ইতিহাস আদি ভারতীয় গ্রন্থগুলোকে ছেড়ে বিদেশী গান গাইলে, তখন এটি লেখা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে সত্য এই হয়। আমাদের এই বিষয়ে বিদেশীদের বা তাদের মানসপুত্রদের কাছ থেকে কিছু

---

[1] এখন তো আচার্য জী ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বৈজ্ঞানিক ভাষ্য 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' নামে বিশাল এক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা পড়লে বড় বড় বৈজ্ঞানিক প্রতিভাবানদের ঘাম ছুটে যাবে — সম্পাদক।

শেখার নেই। তবে হ্যাঁ, আমরা তো নিজেদের প্রবুদ্ধ আর্য বলা বা 'হিন্দু' শব্দ নিয়ে গর্ব করা লোকদের দেখে অবশ্যই লজ্জিত হই এবং দুঃখিও হই যে এদের কী রোগ হয়েছে? কেন আপনাদের ভারতীয়ত্ব এবং ঋষিদের প্রতি ঘৃণা জন্মেছে?

আপনি লিখেছেন — **"শূদ্র নীচ নয় — এতে (সত্যার্থ প্রকাশে) বেশ কয়েকটি আলাদা আলাদা স্থানে শূদ্রদের অনার্য, নীচ, চামার আদি লেখা হয়েছে। প্রবুদ্ধ আর্যদের দৃষ্টিতে শূদ্র ততটাই আর্য, যতটা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য। জাত-পাতের কোনো ভেদ নেই। এমনকি উপনয়ন সংস্কার আদির বিষয়েও শূদ্রদের সাথে বিন্দুমাত্র বৈষম্য তারা মেনে নেন না। তারা এটিও মানেন না যে শূদ্রকে সংহিতা ভাগ পড়ানো যাবে না।"**

সমীক্ষা — এই বিষয়ে সাধারণত মানুষ আম্বেদকরবাদ, গান্ধীবাদ, সাম্যবাদ আদি মতাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আপত্তি তোলেন এবং তারা পুরোপুরি পূর্বধারণার বশবর্তী হন। 'নীচ' শব্দ অনেক প্রসঙ্গে অনেক অর্থ সিদ্ধ হয়। জেলাশাসক একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, তবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী কি নিম্ন কর্মচারী নন? এই কথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? ডাঃ অরোরা কি মহাবিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিজের থেকে নিম্ন কর্মচারী মনে করেন না? সে কি আপনার আদেশ পালন করে না? জল খাওয়ানো, ঝাড়ু দেওয়া আদি কি নিম্নস্তরের কাজ নয়? তারা কি তাকে অধ্যক্ষের সমান মনে করে সেই অনুযায়ী ব্যবহার করে তার অনুকূল সুখ, সুবিধা ও অধিকার দিতে পারেন? সারা বিশ্বে সমতার দাবি করা কোনো দেশ, সংস্থা বা ব্যক্তি কি তা বজায় রাখতে পারে? যোগ্যতা অনুযায়ী ভেদাভেদ হবেই। জন্মভিত্তিক অসমতা তো উচিত নয়, কিন্তু কর্মানুসারে ভেদাভেদ একটি অনিবার্য বাস্তবতা, যা ছাড়া কোনো ব্যবস্থা চলতে পারে না। একজন শ্রমিক যাকে প্রাচীন ভাষায় শূদ্র বলা হতো, সে প্রতিদিন 60-70 টাকা বেতনে সারাদিন কোদাল চালায়, পাথর ভাঙে, গর্ত খুঁড়ে; অন্যদিকে আপনি আয়েশে বড় বড় অট্টালিকায় বসে প্রতিদিন প্রায় 700-800 টাকা আয় করেন, আবার রাষ্ট্রপতি প্রতিদিন প্রায় 2-3 হাজার টাকা নেন। তাহলে ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ের কাজ করা ব্যক্তিদের তুলনায় শূদ্র (শ্রমিক) কি আজও সব দিক দিয়ে নিচু স্তরের নয়? আপনাদের তথাকথিত প্রবুদ্ধদের ঘরের সেবকরা কত বেতন ও সম্মান পায়? সমাজ সেবকদের কী বেতন দেন, দিয়ে দেখুন, তারপর সাম্যের ওকালতি করুন। যেখানে 'নীচ' শব্দটিকে দুরাচারী, পতিত ব্যক্তিকে বলা যেতে পারে, সেখানে 'নীচ' শব্দটিকে নিম্ন, নীচা আদিরই অপভ্রংশ হয়। তাহলে এটা কেমন তামাশা যে নিম্ন শ্রেণী, উচ্চ শ্রেণী সব জায়গায় প্রামাণিকভাবে বিদ্যমান আছে অথচ সেটাই সত্যার্থ প্রকাশে এর প্রচলিত অপভ্রংশ শব্দকে নিয়ে

বিবাদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। একটি শব্দ কেবল প্রসঙ্গ বিশেষেই অর্থ পরিবর্তন করে না, বরং সেটি স্বর ভেদেও নতুন নতুন অর্থ ধারণ করে। তাহলে শব্দ মাত্রকে ধরে অসংগত অর্থ লাগিয়ে নিজের সাম্যের ব্যবহারের ভণ্ডামি করে প্রসিদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা কি পাগলামি ভরা পাষণ্ডতা নয়? তবে হ্যাঁ, দয়ানন্দ যদি জন্মগত উচ্চ-নিম্ন, যার অপভ্রংশ রূপ উঁচু-নিচু হয়, মানতেন তাহলে আপনাদের বলার সুযোগ ছিল।

এখন 'অনার্য' শব্দটি নেওয়া যাক। প্রথমে আপনাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে ঋষি শূদ্রকে কোথাও খারাপ বলেননি। প্রথমত একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত যে মনু বা দয়ানন্দের দৃষ্টিতে অশিক্ষিত শ্রমিক অথচ যারা ধার্মিক, তাদেরই শূদ্র বলা হয়। আজ অনেক উচ্চ শিক্ষিত, উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরাও নিজেকে দলিত, পিছিয়ে পড়া বা আদিবাসী ও শূদ্র বলে সংরক্ষণের ভিক্ষা চাওয়ার চেষ্টা করছেন। এই তথাকথিত শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের ভণ্ডামি নতুন শূদ্র তৈরি করে দিয়েছে এবং নিত্য নতুন শ্রেণী গঠনের প্রতিযোগিতা চলছে। আশ্চর্যের বিষয় হল যারা কারিগর বা ব্যবসায়ী হওয়ার কারণে বৈশ্য বর্ণে আসা উচিত ছিল, যাদের পাষণ্ড ব্রাহ্মণরা শূদ্র বানিয়েছিল এবং এখন তারা রাষ্ট্রপতি, নেতা, উচ্চ শিক্ষাবিদ বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা হয়েও শূদ্রের খোলস পরে ভিক্ষার থালা নিয়ে সংরক্ষণের দাবি করছেন। দুঃখের বিষয় হল সেই পাষণ্ড ভিখারিরাই জন্মগত উঁচু-নিচুর বিষয়টি ভগবান মনুর ওপর আরোপ করে তার বিরোধিতা করছেন। এদের মধ্যে কেউ কর্ম অনুসারে নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য হিসেবে পরিচিত দিতে চান না, কারণ এমনটা করলে তাদের ভিক্ষা কে দিবে? তারাই সমাজে গর্বের সঙ্গে নিজেদের জাতি মানুষ বা আর্য বলে। এই দ্বিমুখী নীতি অনেক প্রবুদ্ধ পরিচয় দেওয়া নকল আর্যদেরও হবে। যেখানেই শূদ্রের আলোচনা আসবে, সেখানে অশিক্ষিত ধার্মিক ও শ্রমিককেই বুঝতে হবে, কোনো শ্রী কে. আর. নারায়ণন, কু. মায়াবতী বা অন্য কোনো নেতা, ছাত্র বা কর্মকর্তা নিজেকে শূদ্র মনে করে যেন দুরাগ্রহবশত সত্যকে অস্বীকার করার চেষ্টা না করেন। সত্যার্থ প্রকাশের যে প্রসঙ্গের ওপর আপত্তি করা হয়, তা বিবেচনা করবো। প্রসঙ্গটি নিম্নরূপ —

প্রশ্ন — আদি সৃষ্টিতে একটি জাতি ছিল নাকি অনেক ?

উত্তর — একটিই মনুষ্য জাতি ছিল। পরবর্তীতে 'বিজানীহ্যার্য্যান্যে চ দস্যবঃ' — এটি ঋগ্বেদের বচন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নাম আর্য, বিদ্বান, দেব এবং দুষ্টদের দস্যু অর্থাৎ ডাকাত, মূর্খ নাম হওয়ায় 'আর্য' এবং 'দস্যু' এই দুটি নাম হয়। 'উত শূদ্রে উতার্য়ে' — ঋগ্বেদ বচন। আর্যদের মধ্যে পূর্বোক্ত প্রকারভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র — এই চারটি বিভাগ হয়। দ্বিজ বিদ্বানদের

নাম আর্য এবং মূর্খদের নাম শূদ্র ও অনার্য অর্থাৎ আনাড়ি রাখা হয়।

(সত্যার্থ প্রকাশ, অষ্টম সমুল্লাস)

প্রায় একই ধরণের প্রসঙ্গ এই সমুল্লাসের পরবর্তী পৃষ্ঠাতেও আছে —

পূর্বোক্ত বেদের প্রমাণগুলো উদ্ধৃত করে ঋষি লিখেছেন —

‘‘এটিও বেদের প্রমাণ — এটি লিখেছি যে আর্য নাম ধার্মিক, বিদ্বান, আপ্ত পুরুষদের এবং এদের বিপরীত ব্যক্তিদের নাম দস্যু অর্থাৎ ডাকাত, দুষ্ট, অধার্মিক ও অ-বিদ্বান; এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজদের নাম আর্য এবং শূদ্রদের নাম অনার্য অর্থাৎ আনাড়ি।’’

এর সারমর্ম হল, পরমাত্মার সৃষ্টিতে একটিই মনুষ্য জাতি ছিল অথবা মানুষ হিসেবেই জন্ম গ্রহণ করে। পরে এই মানুষই গুণের পার্থক্যের কারণে দুই ভাগে বিভক্ত হয় —

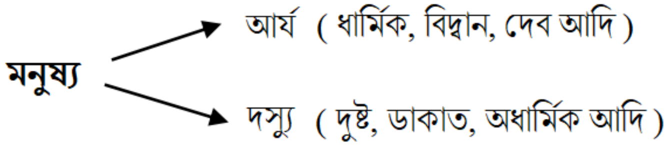

পুনরায় —

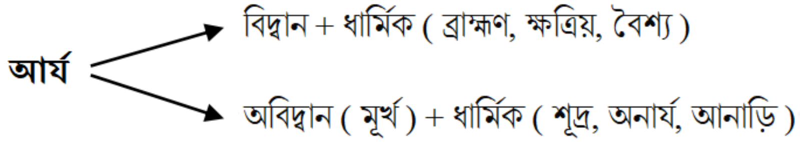

এটি লক্ষণীয় যে আর্যের প্রধান পরিচয় হল ধার্মিকতা, বিদ্বান হওয়া নয়। এমনটি না হলে দস্যুদের থেকে আলাদা করা সম্ভব হতো না। আর্যদের মধ্যে শূদ্ররা ধার্মিক হলেও মূর্খ হওয়ার কারণে আনাড়ি হয়ে যায়, যা অনার্য শব্দের অপভ্রংশ রূপ। মনে রাখা প্রয়োজন যে অনার্য শব্দের অর্থ দুষ্ট, ডাকাত বা নিন্দনীয় নয়। এই শূদ্র হল দস্যুর তুলনায় আর্য এবং দ্বিজদের তুলনায় অনার্য। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতায় অর্জুনকে ভ্রান্ত পথে চালিত হওয়ার কারণে অনার্য বলে সম্বোধন করেছেন। এতে আপত্তির কী আছে? কেউ বলতে পারেন যে আর্যের একটি ভেদ আর্য এবং অন্যটি অনার্য কীভাবে ? হ্যাঁ, মানুষের দুটি ভেদ ‘আর্য’ এবং ‘দস্যু’ হতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, রামায়ণ ও মহাভারত যুগে মানুষের মধ্যে রাক্ষস, কিন্নর, দেব, গন্ধর্ব, গৃধ, বানর, নাগ, ঋক্ষ, মানুষ অনেক কীভাবে হল ? এখানেও মানুষের প্রকারভেদে একটি নতুন প্রকার

‘মানুষ’-ও আছে, বাকি সব অন্য। তবে কী তাদের অন্য কোনো প্রাণী হিসেবে ধরা হবে? না, বরং তাদের মধ্যে মানবতার অংশ কম বা বিশেষ কিছু পার্থক্য আছে, তাই তাদের অন্য নাম দেওয়া হয়েছে। রাম, লক্ষ্মণ, কৌরব, পাণ্ডব প্রমুখকে মানুষ বলা হয়েছে, যেখানে ইন্দ্র, ব্রহ্মা, শিব আদিকে দেব এবং রাবণ, খর, বক আদিকে রাক্ষস; হনুমান, সুগ্রীবকে বানর আদি বলা হয়েছে। একইভাবে আর্যদের থেকে শূদ্রদের একটি আলাদা বিভাগ হিসেবে বোঝা উচিত। বর্তমানে আমি ডাঃ অরোরা জী-কে জিজ্ঞাসা করছি যে কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার কলেজে কতজন স্টাফ আছে? ধরা যাক আপনি বললেন যে 200 জন। এখন এই স্টাফের মধ্যে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, লিপিক, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সবাই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যখন আপনার বেতনের বিল তৈরি হবে, তখন কর্মকর্তাদের আলাদা এবং স্টাফদের (কর্মচারীদের) আলাদা তালিকা তৈরি হবে। এখানে আপনি স্টাফ বলবেন না বরং ‘গেজেটেড অফিসার’ বলবেন, কারণ কর্মচারী বলতে আপনার লজ্জা লাগবে। এই পার্থক্য কীভাবে হল যে স্টাফের দুটি প্রকারের মধ্যে একটি ভাগ স্টাফ এবং অন্য ভাগ নন-স্টাফ? তাহলে আর্যের প্রকারভেদ আর্য (দ্বিজ) এবং অনার্য (শূদ্র) কেন হতে পারবে না?

এখন ‘ভাঙ্গি’, ‘চামার’ শব্দগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথমত এটি লক্ষণীয় যে কোন শব্দ কোন প্রেক্ষাপটে এবং পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়েছে, তা বিচার করা আবশ্যক। আজ যে বর্গ সাফাইয়ের কাজ করে, সেই সময় ভারত জুড়ে তাদের ‘ভঙ্গী’ বলা হতো। কাজটিও ময়লা টানার ছিল, এই কারণে শব্দটি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যদিও এই শব্দের অর্থ — পতিত (বিদ্যা আদি থেকে), হতাশ, পরাভূত, পরাজিত আদি হয়। সেই সময় কর্ম বা বিদ্যার দৃষ্টিতে এমনই ছিল। বেচারা হতাশ, নিরাশ ও নিতান্ত অশিক্ষিত ছিল। ধীরে-ধীরে এই শব্দটি ‘গালি’ হিসেবে গণ্য হতে শুরু করে। গান্ধীজির কাছে এই শব্দটি খারাপ মনে হওয়ায়, তিনি সম্মানজনক শব্দ ‘হরিজন’ এর উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ডাঃ আম্বেদকর এটিকে ভালো মনে করেননি, বরং একে উপহাসমূলক বলে ‘দলিত’ শব্দটি গ্রহণ করেন। তখন ‘হরিজন’ শব্দটিও খারাপ হয়ে যায়। আজ এই সব শব্দই খারাপ মনে করা হয় এবং ‘বাল্মীকি’ এই নতুন শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। এর অর্থ হল, বিশেষ শব্দ ব্যবহারের ধরণ, তৎকালীন পরিস্থিতি এবং ব্যবহারকারীর ভাবনার ওপর ভিত্তি করে তা ভালো বা মন্দ হতে পারে। এই কারণে সেই সময় ঋষিদের প্রয়োগ করা শব্দ খারাপ ছিল না। একইভাবে ‘চমার’ শব্দটি ‘চর্মকার’ শব্দের অপভ্রংশ রূপ। ‘চমার’ শব্দটিও সেই সময় অশিক্ষিত এবং চামড়ার ব্যবসা করা ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহৃত হতো। লোহার কাজের সাথে যেমন

লোহার, সোনার সাথে সোনার, কুম্ভের বা মাটির পাত্রের সাথে যেমন কুম্ভকারের সম্পর্ক, তেমনই চামড়ার সাথে চমারের সম্পর্ক। আপনি সম্ভবত শ্রী কে. আর. নারায়ণন জী-কে 'চমার' মনে করেন। তিনি নিজেকে দলিত বলেন। মানুষও এমনটা বলে তুষ্টিকরণের পথ অবলম্বন করে, কিন্তু আমাদের দয়ানন্দ সরস্বতী তো তাঁদের ক্ষত্রিয় বলবেন। কেউ বলুক যে চামড়ার ব্যবসায়ী যদি চর্মকার না হয়, তবে কী বলা হবে? এখন এই দুটি শব্দের প্রয়োগ মহর্ষি (দয়ানন্দ) 'সত্যার্থ প্রকাশ' এর দ্বিতীয় সমুল্লাসে নিম্নোক্ত ভাবে করেছেন —

ভূতপ্রেত বিষয়ে তিনি লিখেছেন — "তারা ঔষধি সেবন এবং পথ্যাদি সঠিক ব্যবহার না করে সেই ধূর্ত, পাষণ্ডী, মহামূর্খ, অনাচারী, স্বার্থান্বেষী, ভঙ্গী, চমার, শূদ্র, ম্লেচ্ছাদির ওপর বিশ্বাসী হয়ে অনেক প্রকার ঢং, ছল-চাতুরি এবং উচ্ছিষ্ট ভোজন, ডোরা-সুতো আদি মিথ্যা মন্ত্র-যন্ত্র বাঁধতে বা বাঁধিয়ে ঘুরে বেড়ায়।"

এতে পাষণ্ডী ও ঠগদের কেন এমন লেখা অনুচিত মনে হয়েছে? ভঙ্গী, চমার শব্দগুলোর ওপর আমি আগেই লিখেছি। **'চমার'** শব্দটি সেই সময় খারাপ ছিল না এবং এর অর্থও খারাপ নয়, তবে একে অবজ্ঞার যোগ্য মনে করা হয় আর এবং আজ জাটভ, মেঘওয়াল, রৈগর ও জটিয়া আদি অনেক নাম প্রচলিত হয়ে গেছে। এখানে ঋষির অভিপ্রায় হল — যদি কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি ভূত-প্রেত, যা বিশেষ কোনো রোগ বা ভণ্ডামি, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, ধূর্ত এবং ঠগদের বিশ্বাস করে এবং চিকিৎসা না করায়, তবে ঋষি যদি এমন লিখে থাকেন, তাতে অনুচিত কী আছে? যদি আপনি কোনো বৌদ্ধিক কাজে বিদ্বানদের পরামর্শ না মেনে শূদ্র অর্থাৎ নিজের শ্রমিক বা অন্য কোনো ধূর্তকে বিশ্বাস করেন, তবে তা কি আপনার জন্য উচিত হবে? তাহলে ঋষিকে সমালোচনা করার কী ভিত্তি আপনার কাছে আছে? আপনার এই কথা যে, শুদ্রকে সংহিতা ভাগ না পড়ানো শুদ্ধ আর্য, দয়ানন্দীয় এবং দয়ানন্দের মত —তা প্রবুদ্ধদের কাছে মান্য নয়। আমি এই বিষয়ে স্পষ্ট করে দিই যে, এটি দয়ানন্দের মত নয় এবং দয়ানন্দীয়দেরও নয়। সত্যার্থ প্রকাশে যেখানে এই প্রসঙ্গটি আছে, সেখানে অধিকার অনধিকারের প্রসঙ্গই নেই। সেখানে প্রসঙ্গটি অগ্নিহোত্র নিয়ে চলছে এবং পরবর্তী বিষয়টি ব্রহ্মচর্য সংক্রান্ত। মাঝখানে সুশ্রুত-এর প্রমাণ দিয়ে ঋষি লিখেছেন —

''কুলীন ও শুভ লক্ষণযুক্ত শুদ্র হলে, তাকে মন্ত্র সংহিতা বাদ দিয়ে সব শাস্ত্র পড়ানো উচিত, শুদ্র পড়ুক কিন্তু তার উপনয়ন হবে না। এটি অনেক আচার্যদের মত।''

(সত্যার্থ প্রকাশ, তৃতীয় সমুল্লাস)

সত্যার্থ প্রকাশ — উদীয়মান প্রশ্ন গর্জনশীল উত্তর

এখানে ঋষি সুশ্রুত ও অন্যান্য আচার্যদের মত দিয়েছেন, কিন্তু নিজে এর ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি এবং নিজের মতও স্পষ্ট করেননি। এর কারণ হল এই প্রসঙ্গটি সামনে আসবে এবং সেখানেই বিস্তারিতভাবে স্পষ্টীকরণ দেওয়া আছে। কিন্তু ডাঃ অরোরা বা অন্য বিদ্বেষী ক্ষুদ্রবুদ্ধি (নাকি প্রবুদ্ধ) সম্পন্ন লোকেরা যেন রামবাণ পেয়ে গেছেন। দেখুন, সেখানে লেখা আছে —

''প্রশ্ন — স্ত্রী ও শুদ্র কি বেদ পড়বে ? যদি তারা পড়ে, তবে আমরা কী করবো ? আর তাদের পড়ার সপক্ষে কোনো প্রমাণও নেই।

উত্তর — সব স্ত্রী ও পুরুষ অর্থাৎ মানুষ মাত্রেরই বেদ পড়া ও পড়ানোর অধিকার আছে। আর তোমরা কুয়োয় পড়ো... এবং সব মানুষের বেদাদি পড়া ও শোনার অধিকারের প্রমাণ য়জুর্বেদের 26 তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে আছে।

য়থেমাম্ বাচম্ কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজ্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় চ।। (য়জুর্বেদ 26.2)"

এর অর্থ সত্যার্থ প্রকাশ ও বেদ ভাষ্য-তে দেখে নিন। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঋষি লিখেছেন —

''ঈশ্বর কি শূদ্রদের ভালো চান না ? ঈশ্বর কি পক্ষপাতী যে তিনি শূদ্রদের জন্য বেদ পড়া-শোনার নিষেধ এবং দ্বিজদের জন্য বিধি করবেন? যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রায় শূদ্রদের পড়ানো বা শোনানোর না হতো, তবে তিনি তাদের শরীরে বাক্ এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয় কেন তৈরি করেছেন ? যেমন পরমাত্মা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য এবং অন্নাদি পদার্থ সবার জন্য বানিয়েছেন, তেমনই বেদও সবার জন্য প্রকাশিত করেছেন। আর যেখানে কোথাও নিষেধ করা হয়েছে, তার অভিপ্রায় এই যে — যাকে পড়ানোর পরেও কিছুই মাথায় আসে না, সে নির্বুদ্ধি এবং মূর্খ হওয়ার কারণে শূদ্র বলে পরিচিত। তাকে পড়ানো বা তার পড়া নিরর্থক।''

এত স্পষ্ট এবং কঠোর উত্তর যে 'তোমরা কুয়োয় পড়ো...' দেওয়ার পরেও আপনাদের বুদ্ধিতে আসা বিকার ও দ্বেষের কালিমা দূর হয়নি! ঋষি উপরোক্ত সুশ্রুত প্রমাণের স্পষ্টীকরণও সাথে দিয়ে দিয়েছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করছি, যদি কেউ বলে যে বর্ণমালার জ্ঞান বা গণিতের যোগ-বিয়োগ না জেনে আপনার কাছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা সিদ্ধান্ত পড়তে চায়, তবে কি আপনি এটা

বলবেন না যে তোমার এটি পড়ার যোগ্যতা নেই এবং অধিকারও নেই। আর যদি পড়ানোও হয়, তবে 'ভৈঁস কে আগে বীন' (অবুঝের কাছে জ্ঞান দেওয়া) প্রবাদটি চরিতার্থ হবে। তাহলে এটিকে বৈষম্য কীভাবে বলা যেতে পারে ? আশা করি এবার আপনার বুদ্ধির দুয়ার খুলে যাবে।

এখন আলোচনা করবো উপনয়ন সংস্কারের অধিকার নিয়ে —

ঋষি পূর্বোক্ত (সুশ্রুত) প্রকরণে নিজের মন্তব্য স্পষ্ট করেননি। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত বেধাধিকার বিষয়ে বুঝে নেওয়া উচিত, কারণ উপনয়ন ছাড়া বেদ পড়ার অধিকারই পাওয়া যায় না। পুনরায় ডাঃ অরোরার পূর্বাগ্রহের চিকিৎসার জন্য ঋষির স্পষ্ট অভিমতও দিচ্ছি —

''দ্বিজগণ তাদের সন্তানদের উপনয়ন সম্পন্ন করে আচার্য কুলে অর্থাৎ যেখানে পূর্ণ বিদ্বান পুরুষ এবং পূর্ণ বিদুষী নারী শিক্ষা ও বিদ্যাদান করেন, সেখানে ছেলে ও মেয়েদের পাঠিয়ে দেবেন। আর শূদ্রাদি বর্ণের সন্তানদের উপনয়ন ছাড়াই বিদ্যাভ্যাসের জন্য গুরুকুলে পাঠিয়ে দেবেন।'' (সত্যার্থ প্রকাশ, দ্বিতীয় সমুল্লাস)

''প্রথম ছেলেদের যজ্ঞোপবীত (পৈতা) বাড়িতে হবে এবং দ্বিতীয়টি পাঠশালায় আচার্য কুলে গিয়ে হবে।'' (সত্যার্থ প্রকাশ, তৃতীয় সমুল্লাস)

এই দুটির ওপর বিচার করলে নিম্নলিখিত ফলাফল পাওয়া যায় —

1. দ্বিজ অর্থাৎ যারা বেদবিদ্যার জ্ঞাতা, তারা শিশুদের সংস্কার বাড়িতেই সম্পন্ন করে আচার্য কুলে পাঠিয়ে দেবেন।
2. শূদ্র অর্থাৎ অক্ষরজ্ঞানহীন কিন্তু ঈর্ষারহিত, সেবাভাবী, ধর্মীয় সেবক তাদের সন্তানদের যজ্ঞোপবীত সংস্কার করবেন না। এর কারণ হিসেবে লেখা হয়েছে যে তারা সংস্কার করার যোগ্যতা রাখেন না এবং যোগ্যতা ছাড়া অধিকার পাওয়া যায় না। তথাপি যে শিশুটি এখনো যোগ্য-অযোগ্যতার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়নি, তাকে আচার্য কুলে অবশ্যই পাঠানো হচ্ছে অর্থাৎ তারও পড়াশোনার সুযোগ পাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে।
3. উপনয়ন সংস্কার নিজ গৃহ ছাড়াও আচার্য কর্তৃক গুরুকুলেও করা হয়, তখন সেখানে আচার্য সকল বালকের যোগ্যতা দেখে সংস্কার করিয়ে দেবেন। যদি কেউ শূদ্রত্বের গুণই ধারণ করে থাকে, তবে তিনি করাবেন না। এটি সর্বথা উচিত যে যজ্ঞোপবীতের কর্তব্য যে পালন করতে পারে না, তাকে তা কেন দেওয়া হবে ? আজ যেভাবে মাংসাহারী রাক্ষস, লম্পট, কামুক, মদ্যপায়ী এবং দুষ্ট ব্যক্তিদের প্রসাদের মতো কোনো পরিচয় ছাড়াই যজ্ঞোপবীত বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা মোটেই উচিত নয়। এই কারণেই ঋষিদের এমন

বিধান নেই। এইভাবে শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করা যোগ্য বালকের উপনয়ন একবার অর্থাৎ আচার্য কুলেই হবে, সেখানে দ্বিজ কুলোৎপন্ন যোগ্য বালকের যজ্ঞোপবীত দুইবার (স্বগৃহে ও গুরুকুলে) তথা দ্বিজ কুলোৎপন্ন কিন্তু অযোগ্য এবং শূদ্রকুলোৎপন্ন অযোগ্যের যজ্ঞোপবীত যথাক্রমে একবার (স্বগৃহে) এবং একবারও হবে না। এর সাথে এটিও বুঝে নেওয়া উচিত যে, দ্বিজের বালকের বিদ্যা গ্রহণের যোগ্যতার সম্ভাবনা শূদ্রের বালকের তুলনায় বেশি থাকবে, কারণ প্রথমত পিতা-মাতার বিদ্বান হওয়া, গৃহে বিদ্যার সংস্কার ও পরিবেশ হওয়া এবং বংশগতি গুণের (বিজ্ঞানীদের নতুন মতানুসারে 75 শতাংশ সংস্কার জিন্স দ্বারা সন্তানে আসে) কারণে হয়। যেমন উচ্চ শিক্ষিতদের সন্তানরা প্রায়ই উচ্চ শিক্ষায় এগিয়ে থাকে, অশিক্ষিতদের সন্তানদের তুলনায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এর বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব অবশ্যই আছে তবে অপেক্ষাকৃত কম। এইভাবে বর্ণ বেছে নেওয়ার সুযোগ পাওয়ার অধিকার সকলের সমান, কিন্তু বর্ণ প্রাপ্ত করার অধিকার যোগ্যতা অনুসারে হয়। আজও যেমন কালেক্টর হওয়ার অধিকার সবার আছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ চাইলে তাকে কালেক্টর বানিয়ে দেওয়া হবে। এর পরীক্ষায় অর্থাৎ আই.এ.এস.-এ বসার জন্য ন্যূনতম স্নাতক হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু স্নাতক হলেও কথা শেষ হয় না। আই.এ.এস.-এর সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে, তারপর সাক্ষাৎকারেও উত্তীর্ণ হতে হবে, তবেই কেউ কালেক্টর বা অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হতে পারবে। আজও যখন সমান অধিকার নেই বরং যোগ্যতাবাদ বিদ্যমান আছে, তখন দয়ানন্দকে দোষী সাব্যস্ত করে কেন পাগলামি প্রকাশ করা হয়েছে? এখন তথাকথিত শূদ্র হিতৈষী বা জন্মগত জাত-পাত মেটানোর ভণ্ডামি যারা করে, ভগবান মনু বা ভগবান দয়ানন্দের যারা সমালোচনা করে, তাদের চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যে — জন্মগত সংরক্ষণের ভিক্ষা যারা চায়, এর জন্য জন্মগত জাতিগত শংসাপত্র (Caste Certificate) নেওয়ার জন্য যারা কার্যালয়ে চক্কর কাটে, স্বার্থের জন্য যারা নিজেদের দলিত, অনগ্রসর বলে তারা কি সমান অধিকারের কথা বলার অধিকারী? দলিতদের নামে রাজনীতি করা সহজ কিন্তু সমতার আচরণ করা ততটাই কঠিন।

এখন ডাঃ অরোরার মূর্তিপূজা প্রকরণটি দেখা যাক। তিনি লিখেছেন —

"মূর্তিপূজার বিষয়ে প্রবুদ্ধ আর্যদের দৃষ্টিভঙ্গি শুদ্ধ আর্যদের থেকে ভিন্ন। যদি স্বামী দয়ানন্দের বচনকেই প্রমাণ হিসেবে মানা হয়, তবে মূর্তিপূজা ঘোর পাপ। কেবলমাত্র একজন নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা করাই যোগ্য। এই কথা বৈদিক মতানুকূল নয়। বেদের কোনো মন্ত্রে

বা কোনো স্মৃতিতে এটি লেখা নেই যে মূর্তিপূজা পাপ হয়। বেদের মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, বনস্পতি আদিকে দেবতা বলা হয়েছে। এই দেবতাদের উপাসনা শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতিতে সহায়ক হয়... এক ঈশ্বরের উপাসনা এবং মূর্তিপূজার বিরোধিতা হল সামী (ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম) মতাদর্শের দান। এঁদের প্রভাবেই স্বামী দয়ানন্দ জী মূর্তিপূজাকে পাপ বলেছেন এবং লিখেছেন...।”

সমীক্ষা — লেখিকার দম্ভ দেখুন যে তিনি সমস্ত বেদ ও স্মৃতির ওপর নিজের অধিকার জাহির করেছেন। আর্য জগতের অনার্য সম্পাদক শ্রী উদয়বীর জী বিরাজ ‘চুরি তো চুরি আবার জোরাজুরি’ প্রবাদটি চরিতার্থ করে মূর্তিপূজার বিরোধে আমাদের কাছে বৈদিক প্রমাণ চেয়েছেন। (দেখুন- আর্য জগৎ 7 জুলাই 2002, পৃষ্ঠা- 6, পত্র জগতে)।

প্রথমে তো আমি জিজ্ঞাসা করবো যে, মূর্তিপূজার সমর্থনে তো আজ পর্যন্ত জগতের কোনো বিদ্বান একটি প্রমাণও দিতে পারেননি। তাহলে এই বিরাজ বা অরোরা কারা ? অথচ আমাদের বিরোধে 20-25টি প্রমাণ সম্পাদক চেয়েছেন। এই বিষয়ে ‘সত্যার্থ প্রকাশ’-এর 11তম সমুল্লাসে ভালোভাবে প্রকাশ ফেলে হয়েছে।

প্রশ্ন — মূর্তিপূজায় পুণ্য নেই, তো পাপও তো নেই।

উত্তর — কর্ম দুই প্রকারের হয় —

(1) বিহিত — যা কর্তব্যবোধে বেদে সত্য ভাষণাদি হিসেবে প্রতিপাদিত হয়েছে।

(2) নিষিদ্ধ— যা অকর্তব্যবোধে মিথ্যা ভাষণাদি হিসেবে বেদে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

যেমন বিহিত কর্ম সম্পাদন করা ধর্ম, আর তা না করা অধর্ম; ঠিক তেমনই নিষিদ্ধ কর্ম করা অধর্ম এবং তা না করা ধর্ম। যখন বেদে নিষিদ্ধ মূর্তিপূজাদি কর্ম আপনারা করেন, তবে তা পাপ হবে না কেন ?

সাধারণ বুদ্ধির বিষয় যে, বেদ অনেক জায়গায় ঈশ্বরকে নিরাকার, প্রতিমা-রহিত এবং সর্বব্যাপী বলেছে। যেমন — **ন তস্য প্রতিমাऽস্তি** (য়জু. 32.3), **অকায়মব্রণমস্নাবিরম্** (য়জু. 40.8), **অপাদিন্দ্রো** (ঋ. 8.69.11), **বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ** (য়জু. 17.19), **তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ** (য়জু. 40.5), **নৈনমূর্ধবম্ ন তির্য়ঞ্চম্ ন মধ্যে পরি জগ্রভত্** (য়জু. 32.2), **সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ** (য়জু. 31.1)

তাহলে তাঁকে প্রতিমাযুক্ত মনে করে পূজা করা অসৎ চিন্তা, অসৎ আচরণ এবং অসৎ কর্ম হল কি না? বেদ-বিরুদ্ধ হল কি না? আবার অসত্য আচরণ করা পাপ হয়। অসত্য আচরণকারীকে বেদ বিভিন্ন স্থানে পাপী বলেছে। দেখুন, সেই পাপীদের গতি —

1. **অসন্নস্তাস্তত ইন্দ্র বক্তা** (অথর্ব. 8.4.8)
   অর্থাৎ হে ইন্দ্র! অসত্যবাদীর সর্বনাশ হোক।

2. **তদিত্তু সোমোऽবতি হন্ত্যাসত্** (অথর্ব. 8.4.12)
   অর্থাৎ ঈশ্বর সত্যকে রক্ষা করেন ও অসত্যকে বিনাশ করেন।

3. **যদি বাহমনৃতদেবো অস্মি** (অথর্ব. 8.4.14)
   এখানে মিথ্যাবাদীদের বিনাশের সংকেত দেওয়া হয়েছে।

4. **সত্যম্ ধূর্বন্তমচিতম্ ন্যোষ** (অথর্ব. 8.3.21)
   অর্থাৎ সত্যকে বিনাশকারী অচেতন ব্যক্তিকে পুড়িয়ে দাও।

এখনও কি একে পাপ মনে করবেন না? কেউ যদি বলে যে কবুতর নামক পাখিই হল মানুষ, আর অন্য জায়গায় বিচারক বলেন যে যারা মিথ্যাবাদী হবে তারা পাপী ও দণ্ডনীয় হবে। তাহলে সমস্ত প্রবুদ্ধ সম্পাদক ও লেখিকা কি বলবেন? কবুতরকে মানুষ বলা ব্যক্তি পাপী ও দণ্ডনীয় হল কি না? যদিও তাকে সরাসরি দণ্ডনীয় বলা হয়নি। আমি প্রবুদ্ধ শ্রী উদয়বীর জী বিরাজ বা ডাঃ সাহিবাকে জিজ্ঞাসা করবো যে আপনারা বলেন, ‘আমরা উচ্চশিক্ষিত ও সদাচারী মানুষ’, আবার অন্যদিকে বলেন, ‘যে বিপরীত আচরণ করবে, তাকে পাপী ও দণ্ডনীয় মানা হবে’। তখন কোনো উদ্ধত ব্যক্তি আপনাকে মহামূর্খ, দুরাচারী, বানর, কচ্ছপ, সাপ, শূকর আদি বলে আপনার সঙ্গে নিজের ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী আচরণ করলে, আপনি কি তাকে পাপী মনে করে শাস্তি দেবেন না? পুনরায় আরও ভালো করে বুঝে নিন —

আপনি কোনো ছাত্রকে বললেন — ‘‘সময় মেনে চলবে। শ্রেণিকক্ষে কেবল পড়াশোনা করবে। পোশাক ঠিকমতো পরবে। মিলেমিশে থাকবে।’’ যদি কোনো ছাত্র অসময়ে আসে বা চলে যায়, ক্লাসে গোলমাল করে, প্যান্টের জায়গায় জামা আর জামার জায়গায় প্যান্ট ঝুলিয়ে রাখে, সবার সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে; তবে আপনার দৃষ্টিতে সে কি অপরাধী ও দণ্ডনীয় হবে না? যদি হ্যাঁ হয়, তবে আমি আপনাদের দুই মান্য অহংকারী প্রবুদ্ধদের কাছ থেকে 20-25টি নয়, বরং মাত্র একটিই প্রমাণ চাইবো যে, কোথায় এমন আচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে? বলুন!

বিরাজ মহাশয় বা অধ্যাপিকা মহোদয়া! আমার কাছে মূর্তিপূজাকে পাপ বলার 20-25টি প্রমাণ চান, আর আপনারা মূর্তিপূজাকে বেদের অনুকূল মনে করেন? ওহে মহানুভবগণ! নিজের অহংকার ত্যাগ করুন, বিদ্বেষপূর্ণ ও পাপী ভাবনার চশমা খুলে মনোযোগ দিয়ে দেখুন। বেদে ঈশ্বরকে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, তার বিপরীতে তাঁকে মানুষ, পশু বা পাখি মনে করে বিরুদ্ধ আচরণ ও অপমান করে যে পাপ করা হচ্ছে, তার জন্য শাস্তি কেন মিলবে না? কত প্রমাণ দেবো? আপনার পাশ্চাত্যপন্থী বুদ্ধি কী বুঝবে? বেদে বারবার বলা হয়েছে যে তিনি এক, তবুও আপনারা দয়ানন্দের ওপর এই অভিযোগ এনেছেন যে, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের প্রভাবে এসে দয়ানন্দ একেশ্বরবাদ সমর্থন এবং মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেছেন। এটি লিখতে আপনাদের কি সামান্য লজ্জাও হল না! আমি জিজ্ঞাসা করছি, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের খণ্ডন (ঋষি দয়ানন্দ) কি আপনার পূর্বপুরুষদের ভয়ে করেছিলেন, যাঁরা অত্যন্ত বলশালী ও ঐশ্বর্যবান মূর্তিপূজক ছিলেন? দয়া করে বলুন, সেই পূর্বপুরুষদের নাম যাতে এই নতুন ইতিহাসের স্বরূপ দেখা যায় (?) মনে রাখবেন মূর্তিপূজা হয়তো কম পাপ হবে, কিন্তু আপনার এই দ্বেষপূর্ণ আচরণ হল ঘোর পাপ।

এরপর আপনি লিখেছেন —

''প্রবুদ্ধ আর্য সমাজীরা উদার হয়। শাকাহার ও মাংসাহারের বিষয়ে তাদের চিন্তাধারা হল শুদ্ধ আর্য সমাজীদের থেকে ভিন্ন। .....মাংসাহার আর্য হওয়া বা না হওয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। ধর্ম হল মনের বিষয়, শরীরের নয়। অথর্ববেদের নবম কাণ্ডের ষষ্ঠ সূক্তের 3 ও 4 পর্যায়ে অতিথিকে মাংস খাওয়ানোর লাভ এবং না খাওয়ানোর দোষ বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। অতএব, শাকাহারকে আর্যত্বের সাথে জোড়া নিরর্থক হবে।''

সমীক্ষা— এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লেখিকা হলেন সেই পাশ্চাত্য তথাকথিত বেদবিদ্ বা সায়ণাচার্য প্রমুখের অনুগামিনী, যার প্রচার আজকাল অনেক ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় করা হচ্ছে। সম্পাদকও মাংসাহারের বিরোধে বেদ থেকে প্রমাণ চেয়ে নিজেকে মাংসভোজী বা মাংসের সমর্থক হিসেবেই সিদ্ধ করেছেন। লেখিকা 'উদার' শব্দটি ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা পাননি। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রতম জীবেরও হিংসা করে না, সেই শাকাহারী হল অনুদার এবং যে রাক্ষসপ্রবৃত্তির লোকেরা অসংখ্য পশুপাখিকে মেরে নিজেদের পেটকে সেই নির্দোষ প্রাণীদের শ্মশানস্থলে পরিণত করেছে, তারা কি উদার ও দয়ালু হয়ে গেল? তারা কি উদার ও দয়ালু হয়ে গেল? মনে হয় লেখিকার তীব্র জ্বর হয়েছে বা মানসিক উন্মাদনা দেখা দিয়েছে, যার বশবর্তী হয়ে অন্যথা বিড়বিড় করছেন।

আমি এই দুই শ্রীমানকে জিজ্ঞাসা করছি— কোনো তথাকথিত উদার (?) প্রবুদ্ধ মাংসভোজী দয়ায় (?) বশীভূত হয়ে আপনার সাথে উদারতা (?) দেখিয়ে পাঁঠা-মুরগি-শূকরের মতো আপনাদের শরীর থেকে মাংস পাওয়ার চেষ্টা করে, তবে আপনার বুদ্ধি কি তাকে উদার বলবে নাকি নিষ্ঠুর ও দুষ্ট মনে করে তার প্রতিবাদ করবে ? মনুষ্যেতর প্রাণীদের মারা কি উদারতা আর মানুষের মাংস খাওয়া নিষ্ঠুরতা ? এটা কোন ধরণের ধর্ম ? আরে, কোনো প্রবুদ্ধ নামধারীকে যদি মাংসই খেতে হয়, তবে মলমূত্রভোজী শূকর অথবা পাঁঠা, মুরগি, হরিণ, কচ্ছপ, মাছ, কুকুর বা সাপকেই কেন খাবে ? সুন্দর মেওয়া, মিষ্টান্ন, ফলমূল খাওয়া মানুষের শরীর ভালো হবে এবং মানুষের মধ্যেও তথাকথিত প্রবুদ্ধদের মান ভালো হবে, যাতে তারাও বুদ্ধিমান হয়ে ওঠে এবং আপনাদের মতো হয়, তাহলে তো কথাই নেই। যার ফলে দয়ানন্দ বা অন্য ঋষিদের মেধাকে ম্লান করার মতো এক প্রজ্ঞাবান মানুষ তৈরি হবে! বলুন! কেমন হবে ?

লেখিকার দর্শনের যোগ্যতা দেখুন — 'ধর্ম মনের বিষয়, শরীরের নয়।' আমি জিজ্ঞাসা করছি, শরীর দিয়ে যাই করা হোক না কেন, তাকে কি অধর্ম বলা হবে না ? মন ছাড়া কি শরীর এবং শরীরের অভাবে সাধারণ অবস্থায় মন কি কিছু করতে পারবে ? আত্মার অভাবে কি উভয়েই কিছু করতে সক্ষম হবে ? তাহলে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক অস্বীকার করার উন্মাদনা কীভাবে এলো ? আমি জিজ্ঞেস করছি যে, যদি মাংস খাওয়া শরীরের কাজ হয় এবং এর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক না থাকে, তবে ব্যভিচার করা, চুরি করা, ডাকাতি করা, জুয়া খেলা, মিথ্যাচার করা বা কটু কথা বলা — এগুলোও কি শরীরের কাজ হওয়ার কারণে 'অধর্ম' হবে না ? তাহলে আপনার কাল্পনিক বা স্বপ্নলোকের দর্শন কাকে অধর্ম মনে করে ?

কি শ্রী উদয়বীর মহাশয়! এখনও কি প্রমাণ চাইবেন ? তাহলে তাও দেখে নিন —

1. **ইমম্ মা হিঁসীর্দ্বিপাদম্ পশুম্** (য়জু. 13.47)
   এই দুই খুর বিশিষ্ট পশুর হিংসা করো না।
2. **ইমম্ মা হিঁসীরেকশফম্ পশুম্** (য়জু. 13/48)
   এই এক খুর বিশিষ্ট পশুর হিংসা করো না।
3. **মা নো হিঁসিষ্ট দ্বিপদো মা চতুষ্পদঃ** (অথর্ব. 11.2.1)
   আমাদের মানুষ এবং পশুদের বিনাশ করো না।
4. **য়জমানস্য পশূন্ পাহি** (য়জু. 1.1)
   যজমানের পশুদের রক্ষা করো।

5. **অরুষো ধূর্তিঃ প্রণঙ্ মর্ত্যস্য** (ঋ. 1.18.3)
হিংসক মানুষের বিনাশকারী শক্তি যেন সর্বদা নষ্ট হয়ে যায়।

6. **মা স্রেধত** (ঋ. 7.32.9)
অর্থাৎ হিংসা করো না।

7. **প্রজাঃ তন্বা মা হিঁসীঃ** (য়জু. 12.32)
শরীর দিয়ে প্রজাদের হত্যা করো না।

8. **মিত্রস্যাহম্ চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে** (য়জু. 36.18)
আমি সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি।

9. **মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে** (য়জু. 36.18)
আমরা যেন বন্ধুর দৃষ্টিতে দেখি।

অজ্ঞানী মাংসাহারী লেখিকা মহোদয়া বা সম্পাদক মহোদয়! আরও প্রমাণ চান কী ? যদি হ্যাঁ বলেন, তবে নিজের চোখ দিয়েও কিছু দেখুন। আমাদেরই শুধু চোখ নেই, আপনারও আছে। হিংসা ছাড়া কি মাংস মিলবে ? যদি হিংসা করেন, তবে তা বেদ-বিরুদ্ধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। ওহে চক্ষুষ্মান প্রবুদ্ধগণ! দেখুন, বেদে অনেক জায়গায় হিংস্র দুষ্টদের পিষে মারার আদেশ আছে। হিংস্র রাক্ষসদের পিষে-পিষে মেরেই আর্য রাম বধ করেছিলেন। সেই রাক্ষসরাই কি আজ আবার জন্ম নিয়ে আপনাদের প্রশংসাপাত্র হিসেবে উপস্থিত হয়নি তো ? শুনুন! মানুষ কখন পশুদের হত্যা করে—

য়ত্র বি জায়তেয়মিন্যপতুঃ সা পশূন্ ক্ষিণাতি রীফতী রুশতী (অথর্ব. 3.28.1)

যে অবস্থায় বুদ্ধি বিশেষভাবে বিকৃত হয়ে যায়, তখন অস্ত্রাঘাত করে এবং অন্যান্য উপায়ে হত্যা করে পশুদের ধ্বংস করে। বলুন, উদয়বীর মহাশয় বা লেখিকা মহোদয়া! আপনার এবং আপনাদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত বা প্রশংসিত প্রবুদ্ধদের বুদ্ধি বিশেষভাবে বিকৃত হয়ে যায়নি তো ? অন্যথায় কেন মাংসাহারকে উচিত বলতেন এবং এর বিরুদ্ধে বেদের প্রমাণ চাইতেন ?

এই অজ্ঞানী লেখিকা অথর্ববেদে মাংস ভক্ষণের প্রমাণ দিয়েছেন, কিন্তু মনে হয় তিনি নিজে এই প্রকরণটি পড়েননি এবং বিবেচনা করেননি। দেখুন, সেখানে কী লেখা আছে —

প্রজাং চ বা এষ পশূংশ্চ গৃহাণামশ্নাতি য: পূর্বোऽতিথৈরশ্নাতি। (অথর্ব. 9.6.4)

অর্থাৎ সেই গৃহস্থ নিশ্চিতভাবে প্রজা এবং পশুদের ভক্ষণ অর্থাৎ নাশ করে, যে অতিথির আগে

আহার গ্রহণ করে। এর তাৎপর্য হল, যে গৃহস্থ অতিথির পূর্বে ভোজন করে নেয়, তার প্রজা ও পশু নষ্ট হয়। যদি কেউ বলেন যে ভক্ষণ শব্দের অর্থ নাশ হওয়া নয় বরং খাওয়া হয়, তখনও আমি বলবো যে এর অর্থ হল যে ব্যক্তি অতিথির পূর্বে ভোজন করে নেয়, সে যেন নিজের প্রজা এবং পশুদেরই খায়। এরও অভিপ্রায় হল এটাই যে পশু খাওয়া পাপ হয়। যেমন কেউ যদি বলে, 'যদি আমি মিথ্যাচার করি, তবে যেন গরুর রক্ত পান করি', এর অর্থ আপনার প্রবুদ্ধ কী করবে, তা তো আপনারাই জানেন; কিন্তু অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও বলবে যে এখানে গো-রক্ত পানের বিধান দেওয়া হয়নি, বরং তাকে পাপ বলা হয়েছে। মনে হচ্ছে আপনার বুদ্ধিকেও এখানে পক্ষাঘাত গ্রাস করেছে এবং সেটিও অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার ফলে অথবা সেই স্বাদে মগ্ন থাকার কারণে বা তা না পেয়ে শোকগ্রস্ত হওয়ার কারণে হয়ে থাকতে পারে। অন্যভাবে বিচার করলে — যদি ভক্ষণ শব্দের অর্থ খাওয়াই হয়, তবে প্রজা ভক্ষণ করার অর্থ কি নিজের সন্তানকে খাওয়া হবে নাকি অন্য কোনো পশুকে ? এই পুরো প্রকরণে ইষ্ট, পূর্ত, পরাক্রম, বুদ্ধি, কীর্তি, যশ, ঐশ্বর্য আদির ভক্ষণের বর্ণনা আছে, তবে কি এগুলো খাওয়া সম্ভব ? আপনি কি এগুলোর স্বাদ গ্রহণ করেছেন? এমনটা না হলে, অবশ্যই আপনার বুদ্ধি থাকতো। জানি না আপনি আপনার শিক্ষার্থীদের কী এবং কীভাবে পড়ান? এত প্রবল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও পর্যায়ক্রমে 'মাংস' শব্দের অর্থ মাংস করা নেহাতই মতিভ্রম হবে। এখানে মনন সাধক (বুদ্ধিবর্ধক) পদার্থের নাম হল মাংস। একটি শব্দের কি অনেক অর্থ হয় না ? তবে কি প্রসঙ্গের অনুকূলে অর্থের গ্রহণ করা উচিত নয় ? তাহলে আপনার কী রোগ হয়েছে যে আপনি সবকিছু উল্টো দেখছেন ?

হে প্রবুদ্ধ নামধারীগণ! নিবন্ধ কেন, এর ওপর তো একটি পুস্তক লেখা যেতে পারে; কিন্তু আপনাদের মতো লোকেদের জন্য এই নিবন্ধই যথেষ্ট। যদি সাহস থাকে তবে এরই উত্তর দিন। সম্পাদকের কাছে বিশেষ অনুরোধ যে এটি প্রকাশ করার কৃপা করবেন। ভাষা কঠোর ও ব্যঙ্গাত্মক হয়ে গেছে, যা সাধারণত উচিত বলা যায় না; কিন্তু আমাদের গুরুকূলের গুরু দয়ানন্দজীর ওপর দোষারোপকারী দুঃসাহসী ও জ্ঞানহীনদের সাথে কীভাবে মধুর ভাষা ব্যবহার করা যায়, তা আমার চিন্তার অতীত। হ্যাঁ, কোথাও ভুল থাকলে সংশোধন করা যেতে পারে।

প্রভু কৃপা করুন যাতে এই প্রবুদ্ধদের বুদ্ধি ফেরে এবং আমরা সবাই মিলে ঋষির জয়ধ্বনি করি এবং "সংশ্রুতেন গমেমাহি। মাশ্রুতেন বিরাধিষি।"

ইতি শম্

* * * * *

অন্যান্য কিছু সম্ভাব্য শঙ্কার সমাধান

শঙ্কা (1) — সত্যার্থ প্রকাশের অষ্টম সমুল্লাসে মহর্ষি দয়ানন্দ জী সূর্য আদি লোকগুলোতেও মানুষ আদি প্রজা থাকার কথা লিখেছেন। বর্তমান বিজ্ঞান অনুসারে সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা 4000-7000° C পর্যন্ত থাকে। তার ওপরেও করোনা নামক অত্যন্ত উজ্জ্বল অংশ থাকে যা প্রায় 2 লক্ষ °C পর্যন্ত গরম হয়। সূর্যপৃষ্ঠে হাজার হাজার কিমি উঁচু প্রচণ্ড অগ্নির শিখা উঠতে থাকে। ভয়ংকর সৌর ঝড় আসতে থাকে। অনেক বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে। সেখানে কোনো তত্ত্বের এটমও কেবল আয়ন রূপেই থাকতে পারে, যারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। এই অবস্থাকে প্লাজমা অবস্থা বলা হয়। এমন অবস্থায় মানুষ আদি প্রজা থাকা কীভাবে সম্ভব? এমন পরিস্থিতিতে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব কীভাবে সম্ভব? এই কথাটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধি-বিরুদ্ধ হওয়ায় সত্যার্থ প্রকাশের ওপর একটি ভারী কলঙ্ক বলেই মনে হয়। আশ্চর্য যে, বিজ্ঞান ও সত্যের মহান সমর্থক মহর্ষি জী এমন মিথ্যা কথা কীভাবে লিখে দিলেন? আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে এই কথা থেকে উপহাস ছাড়া আর কী-ই বা পাওয়া যেতে পারে?

সমাধান — এই প্রশ্নটি প্রকৃতপক্ষে অনেক উচ্চস্তরের আর্য বিদ্বানদেরও বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। প্রায় 12-13 বছর আগে আমি গুরুকুল যমুনানগর (হরিয়ানা)-এর উৎসবে গিয়েছিলাম। সেই সময় শ্রদ্ধেয় শ্রী আচার্য বলদেবজী, কালওয়া-ও আমার কাছে এই একই শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তখন আমি এটাই বলেছিলাম যে, এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে চিন্তা করিনি। দেরাদুনের পণ্ডিত ঈশ্বরদয়ালু জী আর্য এই বিষয়ের ওপর সমস্ত আর্য সমাজকে অত্যন্ত অসভ্য ভাষায় শাস্ত্রার্থের জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। আমার কাছেও চিঠি এসেছিল কিন্তু আমি আমার লক্ষ্যের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে সেই চ্যালেঞ্জকে কোনো গুরুত্ব দিইনি এবং অন্য কেউ সেই চ্যালেঞ্জে মনোযোগ দিয়েছেন কি না, তা আমার জানা নেই। কিন্তু এখন যেহেতু আমাদের কিছু ট্রাস্টি, বিশেষ করে আকোলার প্রফেসর বসন্ত কুমার জী মদানসুরে এবং মথুরার পণ্ডিত বিপিন বিহারী জী আর্য আমার কিছু সময় আগে প্রকাশিত দুটি লেখাকে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত করার বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন, তাই একইভাবে আরও কিছু প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার অনুরোধও করেছেন। এই কারণে এখন এর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি।

পাঠকগণ! বস্তুত আর্য সমাজের বিদ্বানদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপেক্ষা এবং বেদের বৈজ্ঞানিক স্বরূপের তিরস্কারের এটাই ফল হবে যে, তারা এই ধরণের প্রশ্নগুলোতে হয় নীরব

থেকে অপমানের ঘোঁট গিলতে থাকবেন অথবা নিজেরাই প্রবুদ্ধ আর্যদের বেদের উপেক্ষার গর্তে ঠেলে দেওয়ার পরোক্ষ অংশীদার হবেন। আমার বৈদিক বিজ্ঞান অনুসন্ধান কেন্দ্রের বিদ্বানদের দ্বারা উপেক্ষা থেকে তো এটাই দুঃখজনক সত্য প্রত্যক্ষ হচ্ছে। যা-ই হোক, এবার আপনার প্রশ্নে আসা যাক। বস্তুত আমরা সাধারণত নিজেদের সামর্থ্য, পরিবেশ ও স্বভাবের সাথে তুলনা করে অন্যদের বিচার করি। আমরা সাধারণত 0-50°C পর্যন্ত তাপমাত্রায় থাকার অভ্যস্ত। তাও অনেক উপায়ের ব্যবহার করে তবেই এমনটা করতে পারি, যাতে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকতে পারে। বহু জীব, বিশেষ করে মেরু অঞ্চলের জীব প্রায় -50°C বা -60°C তাপমাত্রাতেও কোনো প্রকার কৃত্রিম উপায় ছাড়াই মনের আনন্দে বেঁচে থাকে। ওদিকে সমুদ্রের গভীরতম অংশে যেখানে জলের অত্যন্ত চাপ থাকে, সেখানে প্রায় 200°C বা এর থেকেও বেশি তাপমাত্রায় ফুটন্ত জলের ধারার মধ্যেও জীবদের দেখা গেছে। এইভাবে প্রায় -60°C থেকে শুরু করে 200°C অর্থাৎ 260°C তাপমাত্রার পার্থক্যের মধ্যে জীবদের দেখা গেছে। সম্ভব যে এর থেকেও বড় তাপমাত্রার পার্থক্যের মধ্যেও এই আমাদের পরিচিত পৃথিবীতেই জীবদের অস্তিত্ব আছে। এই তাপমাত্রার পার্থক্যের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা কখনোই সম্ভব নয়। এই ধরণের জীবদের সম্পর্কে পূর্বে যে কেউ এদের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেও এখন আর এই বিষয়টি সন্দেহজনক নয়। কিন্তু কেউ বলতে পারেন যে এই তাপমাত্রায় থাকা আলাদা বিষয় আর সূর্যের উপরোক্ত প্লাজমা অবস্থায় থাকা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। আজ তো এই বিষয় নিয়েও বড় বিতর্ক আছে যে এই পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও প্রাণী আছে কি না? উড়ন্ত চ্যাপ্টা থালার (UFO) গল্প এবং অন্য লোক থেকে মনুষ্য জাতির প্রাণীদের এই পৃথিবীতে আসার আলোচনা দীর্ঘ কাল ধরে শোনা যায়। অনেক বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ভিনগ্রহী প্রাণীদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও কেউ তা মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। বর্তমানে নিজের প্রতিভার জন্য বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং ভিনগ্রহের প্রাণীদের অস্তিত্বের প্রবল সমর্থক হন।

ডিসকভারি টিভি চ্যানেলে বহুবার তাঁকে এই বিষয়ে জোরালো দাবি জানাতে দেখা ও শোনা গেছে। 09.07.10 তারিখ, শুক্রবার আমি তাঁকে দেখি ও শুনি। তিনি বলছিলেন, ‘‘প্রাণীরা জলের অভাবে -196°C এর অত্যন্ত কম তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারে,’’ অর্থাৎ জল ছাড়াও জীবন সম্ভব। এখন পর্যন্ত সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎ জীবনের জন্য জলের উপস্থিতিকে অনিবার্য মনে করতো। জীবনের সন্ধানে চাঁদ, মঙ্গল ও দূরবর্তী গ্রহগুলোতে প্রচুর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং এখনও অবিরত সেই চেষ্টা চলছে। যদি কোথাও

সামান্য জলের উপস্থিতির সংকেত পাওয়া যায়, তবে বিজ্ঞানীরা সেই অনুসন্ধানকে জীবনের সন্ধানের দিশায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। কিন্তু এখন স্টিফেন হকিংয়ের উপরোক্ত বক্তব্য ইঙ্গিত দিচ্ছে যে জীবনের জন্য জল H_2O থাকা অনিবার্য নয়। তাহলে সেই প্রাণীদের জলবিহীন শরীর কেমন হবে? তাদের খাবারের ব্যবস্থা কী এবং কেমন হবে? এই সব কিছুই এখন বিচিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বিজ্ঞান ধীরে-ধীরে এই বৈচিত্র্যকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্টিফেন হকিং জলবিহীন প্রাণীর ধারণা থেকে আরও অনেক দূর এগিয়ে গিয়ে সেই অনুষ্ঠানেই বলেন — ''ভিনগ্রহের প্রাণীরা গ্যাসের তৈরিও হতে পারে, যারা ক্রমাগত চমকানো বিদ্যুৎ থেকে উর্জা আহরণ করতে পারে। এমন গ্রহ বৃহস্পতি ও শনি হতে পারে। তার চেয়েও এগিয়ে তিনি বলেন যে কিছু প্রাণী হয়তো নিজেদের বয়স বেড়ে যাওয়া থামিয়ে অমর হয়ে গেছে!''

আমি এখন আপনাদের প্রশ্ন করতে চাইবো যে, আপনারা কি কখনও ভেবেছিলেন হকিংয়ের মতো বিশ্বের একজন মহান বিজ্ঞানী প্রাণীদের গ্যাসীয় শরীরের অস্তিত্ব মেনে নেবেন? সেই সঙ্গে কিছু প্রাণীর অমর হওয়ার সম্ভাবনাকেও স্বীকার করবেন। হকিংয়ের মতানুসারে ভাবলে আপনারা দেখতে পাবেন যে এই ধরণের ভিনগ্রহের প্রাণীদের হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, মস্তিষ্ক, হাড়, রক্ত, মাংস, মজ্জা আদি থাকবে না, তাহলে হকিং কেমন শরীরের কল্পনা করছেন? তাঁর এই কল্পনার ওপর কোনো বুদ্ধিজীবী বা নাস্তিক সন্দেহ করবেন না, কারণ তারা হকিংকে একজন মহাবিজ্ঞানী মনে করে তাঁর প্রতিটি কথাকে প্রমাণ হিসেবে মেনে নেবেন। কিন্তু সেই বুদ্ধিজীবীই মহর্ষি দয়ানন্দ জীর ওপর প্রশ্ন তুলবেন, কারণ তাদের কাছে ঋষিত্বের কোনো গুরুত্ব নেই। একটু ভাবুন, হকিংয়ের এই ভিনগ্রহী প্রাণীরা যদি কেবল বিদ্যুতের গর্জন থেকেই উর্জা সংগ্রহ করতে পারে, তবে তাদের জন্য খাদ্য, শ্বাস-প্রশ্বাস বা রক্ত সঞ্চালন তন্ত্রের কোনো প্রয়োজনই থাকে না। একটু ভেবে দেখুন, উর্জার যোগান তো হয়ে গেল। খাদ্য থাকবে না, তাই মল ত্যাগেরও প্রয়োজন হবে না। প্রজনন তন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র কীভাবে কাজ করবে এবং সেই গ্যাসীয় অবস্থার প্রাণীরা কেমন হবে? আপনি এই কথা কীভাবে মানবেন? যদি এটি মানেন, তবে আপনাকে জানাই যে প্লাজমা অবস্থা গ্যাসীয় অবস্থা থেকে মাত্র এক ধাপ উন্নত স্তর হয়। তবে প্লাজমা অবস্থাযুক্ত সূর্যে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা কেন সম্ভব নয়? এটাও কি হকিং মানলে তবেই আপনি স্বীকার করবেন? আপনাকে তো মহর্ষিজীর প্রতিভার কথা ভেবে অবাক হওয়া উচিত যে, কোনো বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম তথা বর্তমান গণিতবিদ্যা ছাড়াই মহর্ষি নিজের প্রতিভা, যোগবল

এবং বেদবিদ্যার সাহায্যে এমন সব রহস্য উন্মোচন করেছিলেন, যা সেই সময়ের পৃথিবীর যেকোনো বিজ্ঞানীর কাছে অজানা ও অকল্পনীয় ছিল। গ্যাসীয় দেহের অস্তিত্বের বিষয়টি হকিং এখন বুঝতে পেরেছেন। মহর্ষির অনেক পরে বিশ্বের উন্নত বিজ্ঞান বিভিন্ন ধরণের বায়ুযান নির্মাণ করেছে, অথচ মহর্ষি সেই সময়েই এমনকি আজকের চেয়েও উন্নত বিমানের ইঙ্গিত নিজের বেদভাষ্যে দিয়েছিলেন। তখনকার পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা যদি ঋষির বেদভাষ্য পড়তেন, তবে তারা সেভাবেই অবিশ্বাস করতেন যেভাবে আজ আপনারা সূর্যে প্রাণীদের অস্তিত্ব নিয়ে করছেন। কিন্তু কিছু সময় পর এটিও প্রমাণিত হবে। স্টিফেন হকিং-এর গ্যাসীয় প্রাণীর কল্পনা থেকে আজ এটি প্রায় প্রমাণিত সত্যের মতো।

প্রশ্ন — ঋষি সূর্য আদিতে বসবাসকারী প্রাণীদের শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের চেয়ে ভিন্ন বলে মনে করেন, এ বিষয়ে আপনার মতামত কী ?

উত্তর — যেসব লোকে (গ্রহে) প্রাণীদের শরীর আকৃতি বিশিষ্ট হয়, সেখানে ঋষির কথা যথাযথ-ভাবে সঠিক। কিন্তু সূর্য আদি নক্ষত্র বা কিছু গ্রহে যেখানে প্রাণীদের শরীর গ্যাস বা প্লাজমা দিয়ে তৈরি, সেখানে ঋষির বক্তব্যের তাৎপর্য হল — সেই প্রাণীদের মধ্যেও ইন্দ্রিয়গুলো নিজ-নিজ কাজ করে। সেখানে নেত্র আদি অঙ্গও প্লাজমা দিয়ে তৈরি হয়। আত্মা ও সূক্ষ্ম শরীর তো সব লোকেই সমান থাকে। এগুলো জ্বলেও না আর গলেও না। স্থূল শরীর বিভিন্ন লোকের পরিবেশ অনুযায়ী কঠিন, তরল, গ্যাস বা প্লাজমা হতে পারে। বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্যাস বা প্লাজমার ক্ষেত্রও বিভিন্ন প্রাণী আদির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ হয়ে কাজ করে। সেই প্রাণীদের আচরণও সেই অনুযায়ীই হয়ে থাকে।

প্রশ্ন — মহর্ষি যখন 'মনুষ্যাদি' শব্দ ব্যবহার করেন, তখন কি এটি বোঝায় না যে মহর্ষি দুই হাত, দুই পা এবং দুটি চোখ বিশিষ্ট মানবাকৃতির প্রাণীর কথাই ভাবছেন ? তিনি কি স্টিফেন হকিংয়ের মতো গ্যাসীয় শরীরের অধিকারী বা বিদ্যুতের চমক থেকে ঊর্জা গ্রহণকারী কোনো অদ্ভুত জীবের অস্তিত্বের কথা বলছেন ?

উত্তর — মনুষ্যাদি বলতে কেবল পৃথিবীতে বিদ্যমান মানবাকৃতির প্রাণীই বোঝাবে, এমনটা মনে করা সঠিক নয়। মহর্ষি য়াস্ক মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন — 'মত্বা কর্মাণি সীব্যতীতি' অর্থাৎ, যে বিচারপূর্বক বা চিন্তাশীল হয়ে কাজ করে, তাকেই মানুষ বলা হয়। এখানে এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর অভিমত হল, সূর্যাদি লোকেও বিদ্যমান প্রাণীরা চিন্তাশক্তি

সম্পন্ন হয়। তাদের আমাদের মতো স্থূল স্নায়ুতন্ত্র না থাকলেও তাদের মধ্যে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় আদির অস্তিত্বের সাথে প্লাজমা অবস্থার জ্ঞানতন্তু বা অঙ্গের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকে, যার মাধ্যমে তারা আমাদের মতোই যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে।

প্রশ্ন — 'মনুষ্য' পদের অর্থ আপনি নিজের কল্পনা অনুযায়ী করে মহর্ষিজীর বক্তব্যের অন্য দিক নিয়ে তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। আপনার এই পক্ষপাত ও পূর্বগ্রহী প্রচেষ্টা সফল হবে না। মহর্ষিজী 'পূষণম্ ত্ব....উচ্যতে' ঋগ্বেদ 6.55.4-এর ভাষ্যে 'অজাশ্বম্' পদের অর্থ করে স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, সূর্যে ছাগল ও ঘোড়া বিদ্যমান আছে। এখন আপনি এই ছাগল ও ঘোড়া — এই হিন্দি পদগুলোর যৌগিক অর্থ করার সাহস করুন এবং বলুন যে এই ছাগল ও ঘোড়াগুলো কেমন ?

উত্তর — প্রথমত আমি সত্যার্থ প্রকাশের ওপর করা শঙ্কাগুলো নিবারণের জন্য সত্যার্থ প্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করবো। মহর্ষিজী দ্বাদশ সমুল্লাসে জৈন মত খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি ভূগোলে 132 টি সূর্যের উত্তাপের কথা উল্লেখ করে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন — ''এখন দেখ ভাই! এই ভূগোলে 132 টি সূর্য এবং 132 টি চন্দ্র জৈনদের ঘরেই হয়তো তপ্ত হবে। আর যারা তপ্ত হবে, তারা বাঁচে কীভাবে ?'' যদি মহর্ষি সূর্যতে পৃথিবীর মানুষের মতো আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণীর অস্তিত্ব স্বীকার করতেন, তবে সূর্য থেকে প্রায় 15 কোটি কিমি দূরে অবস্থিত পৃথিবীতে সূর্যের আলো ও উত্তাপ থেকে সৃষ্ট তাপ 132 গুণ বৃদ্ধি পেলে মানুষ নামক প্রাণীর বেঁচে থাকার বিষয়ে ব্যঙ্গ করতেন না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহর্ষি সূর্যের তলে বা পৃষ্ঠে পৃথিবীর মতো মনুষ্য আকৃতির প্রাণীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

এখন বেদভাষ্যের আলোচনায় আসা যাক। মহর্ষি এই মন্ত্রের সংস্কৃত অংশে 'অজাশ্বম্' পদের অর্থ 'অজাশ্চাশ্বাশ্চাস্মিংস্তম্' করেছেন এবং হিন্দিতে 'যাতে ছাগল ও ঘোড়া বিদ্যমান' — এই অর্থ করা হয়েছে। অথচ এর ঠিক আগের মন্ত্রেও 'অজাশ্ব' পদটি এসেছে, যার অর্থ সংস্কৃত অংশে 'অজোऽনুৎপন্নো বিদ্যুদশ্বো য়স্য তৎসম্বুদ্ধৌ' করা হয়েছে এবং হিন্দি ভাষায় 'অবিনাশী বিদ্যুৎরূপ ঘোড়াওয়ালা' — এই অর্থ করা হয়েছে। এবার ভেবে দেখুন যে, 'অজাশ্ব' শব্দটি উভয় মন্ত্রেই প্রায় সমান। পূর্বের মন্ত্রে যদি অর্থ 'অবিনাশী বিদ্যুৎরূপ ঘোড়াওয়ালা' হয়, তবে ঠিক পরের মন্ত্রেই ছাগল ও ঘোড়ার মতো পার্থিব প্রাণী কোথা থেকে এলো ?

যেমন অনেক আর্য বিদ্বান মনে করেন যে, বেদভাষ্যের আর্য ভাষা (হিন্দি) ভাষ্য মহর্ষির নিজের করা নয়, বরং অন্যান্য বিদ্বানরা করেছেন — আমিও এই মতের সাথে একমত। সেই

বিদ্বানরা কোথাও কোথাও মহর্ষির ভাব বুঝতে না পেরে ভুল অর্থ করে ফেলেছেন। যেখানে মহর্ষির সংস্কৃত ভাষ্য পূর্ণাঙ্গভাবে স্পষ্ট হয়নি অর্থাৎ দ্রুততার কারণে ঋষি হয়তো ভেবেছিলেন যে পাঠক পূর্বের প্রসঙ্গ থেকে অর্থ নিজেই বুঝে নেবেন এবং নিজের ভাষ্য কিছুটা অস্পষ্ট রেখে গেছেন, সেখানে ভাষ্যকাররা (লেখকরা) নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে পূর্বের অর্থের কথা মাথায় না রেখে মনগড়া অর্থ করে ফেলেছেন। যেমনটি উপরে স্পষ্ট যে, পূর্বের মন্ত্রে 'অজাশ্ব' পদের অর্থ স্পষ্টভাবে 'অজোऽনুৎপন্নো বিদ্যুদশ্বো য়স্য তৎসম্বুদ্ধৌ' করা হয়েছিল, সেখানে পরের মন্ত্রে 'অজাশ্বম্' এর অর্থ 'অজাশ্চাশ্বাশ্চাস্মিংস্তম্' করে 'অজ' ও 'অশ্ব' উভয় পদকেই হুবহু রেখে দিয়ে এগিয়ে গেছেন। তারা ভেবেছেন যে যখন 'অজাশ্ব' পদের স্পষ্ট অর্থ উপরে দেওয়া আছেই, তখন ভাষ্য লেখক স্বয়ং 'অজ' ও 'অশ্ব' পদ দুটির অর্থ, যা যথাক্রমে বিশেষণ ও বিশেষ্য হয়, পূর্বের মন্ত্র দেখে করে নেবেন। কিন্তু ভাষ্যার্থকারীরা উপরের মন্ত্রের সংস্কৃত ও স্বয়ং নিজের দ্বারা করা ভাষ্য দেখার চেষ্টাও করেননি এবং 'ছাগল' ও 'ঘোড়া' পদ দুটিকে 'অজ' ও 'অশ্ব'-এর অর্থ হিসেবে চাপিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মহর্ষির বেদভাষ্যকে খুব সাবধানতার সাথে দেখা উচিত, তবেই ভাষ্যার্থ সঠিক হবে।

প্রশ্ন — আপনি মহর্ষির মান্যতাকে সমর্থন করতে স্টিফেন হকিংকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করছেন। এই হকিং তো ঈশ্বর ও পুনর্জন্মের ধারণাকে অস্বীকার করে ভৌতিকী নিয়মের মাধ্যমেই সৃষ্টি উৎপত্তি ও সঞ্চালন হওয়াকে স্বীকার করেন। এই বিষয়ে আপনি কি হকিংকে প্রমাণ হিসেবে মানবেন ? যদি মানেন, তবে আপনার মহর্ষি ও বেদাদি শাস্ত্র মিথ্যা প্রমাণিত হবে; আর যদি প্রমাণ না মানেন, তবে কোথাও প্রমাণ মানা আর কোথাও না মানা তো স্বার্থপরতা হিসেবে গণ্য হবে।

উত্তর — সংসারে কোনো ব্যক্তিই পূর্ণ নয়। কেবল পরমাত্মাই পূর্ণ। এই কারণে কোনো ব্যক্তির সকল বিচারকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা বা সম্পূর্ণ বিরোধিতা করা প্রয়োজন নয়। আমাদের সত্য গ্রহণ ও অসত্য ত্যাগের বিষয়েই তৎপর থাকা উচিত। যে যে বিচার আপনার আত্মার কাছে সঠিক ও সত্য মনে হবে, তা স্বীকার করা এবং যা বিপরীত মনে হবে, তা অস্বীকার করাই হল ন্যায়। অন্ধানুকরণ কারোর জন্যই উচিত নয়। ভৌতিকীর নিয়ম দ্বারা সৃষ্টি উৎপত্তি ও সঞ্চালনের বিষয়কে মহর্ষি এবং তাঁর অনুগামী আমরা সকলেই স্বীকার করি। আমরা এর সাথে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলি যে, সেই নিয়মগুলোর নিয়ন্ত্রক এক চেতন সত্তা আছে। নিয়মগুলো না তো স্বয়ং তৈরি হয় আর না সেগুলো স্বয়ং নিয়ন্ত্রণে থাকে। হকিংয়ের পুস্তক 'দ্য গ্র্যান্ড ডিজাইন' না

দেখেই ভারতীয় মিডিয়া যেভাবে নাস্তিকতার প্রচার করেছে, তা মূর্খতা বা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। পাপের প্রচার খুব বেশি হয় এবং সত্য-পুণ্যের প্রচার হয় না। ভারতীয় মিডিয়া, রাজনীতি ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সমাজ চার্বাক মতে দীক্ষিত নাস্তিক হয়ে পড়েছে। হকিং এই পুস্তকটিতে বাইবেলের অলৌকিক ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ম ছাড়াই কেবল নিজের ইচ্ছায় মাত্র 6 দিনে সম্পূর্ণ সৃষ্টি রচনা করার অলৌকিক ঘটনা এবং বাবা আদম আদির ধারণাগুলোকে খণ্ডন করেছেন। তিনি পুস্তকটিতে বাইবেল এবং বাবা আদম আদির নাম উল্লেখ করে প্রবলভাবে খণ্ডন করেছেন। অন্যান্য দেশের দর্শনের প্রতিও কিছু ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু ভারতীয় বৈদিক ধারণার প্রতি কোনো ইঙ্গিত নেই। এমন মনে হয় যে, হয়তো হিন্দুদের বহুদেববাদে আটকে থাকা হাজার হাজার মত ও পথের জাল দেখে তিনি এটা ভেবে নিজের বিচারে আনেননি যে — হিন্দুদের কোন ঈশ্বরকে মেনে নিয়ে নিজের বিচার লিখবেন? অথবা তিনি ভারতীয় দর্শনের প্রতি জেনেশুনে উপেক্ষা করছেন। বস্তুতঃ যতক্ষণ না বৈদিক ঈশ্বরবাদ বিশ্বজুড়ে প্রচারিত হবে, ততক্ষণ ঈশ্বরীয় সত্তা এবং সেই সঙ্গে কর্মফল ব্যবস্থা ও পুনর্জন্মের ধারণাকে নিয়ে এভাবেই উপহাস করা হবে। দুর্ভাগ্যবশত আজ পর্যন্ত তথাকথিত হিন্দু সমাজ নিজেই বৈদিক মতাদর্শ বোঝার চেষ্টা করছে না, তাহলে হকিংসকে কেন দোষ দিবো? যদি হকিংসের কাছে বৈদিক ঈশ্বরবাদ সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হতো এবং তিনিও যদি কুসংস্কার বা অহংকারে আক্রান্ত না হতেন, তবে ঈশ্বর আদির ধারণাকে অস্বীকার করার কোনো কারণ তিনি খুঁজে পেতেন না। আমি তো তাঁকে ধন্যবাদই দিবো যে তিনি খ্রিস্টানদের দেশে থেকেও বাইবেলের প্রবল খণ্ডন করেছেন। ভারতেও বিজ্ঞানীদের উচিত পুরাণ, জৈন, বৌদ্ধ, কুরআন, বাইবেল আদির অবৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোর খোলাখুলি খণ্ডন করা। তবেই সত্য ধর্মের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা বাড়বে, কিন্তু এর জন্য আর্য বিদ্বানদের নিজেদের প্রমাদ ত্যাগ করতে হবে।

শঙ্কা (2) — সত্যার্থ প্রকাশে মহর্ষি লিখেছেন যে, মানুষের উৎপত্তি পৃথিবী থেকে বৃক্ষের মতো যৌবনাবস্থায় হয়েছে। এটি অত্যন্ত হাস্যকর বিষয় যে, এই পৃথিবী থেকে পূর্ণ যুবক মানুষ (স্ত্রী ও পুরুষ) হঠাৎ মাটির বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে। তাহলে তো গরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, চিতা, সিংহ, হাতি — সবই পূর্ণ যৌবনাবস্থায় পৃথিবী থেকেই বের হয়েছে। কী অদ্ভুত গালগল্প! আর নাম রাখা হয়েছে সত্যার্থ প্রকাশ? বাস্তবতা হল, মানুষের উৎপত্তি বিখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের মতে অ্যামিবা নামক এক এককোষী প্রাণী থেকে বিকশিত হয়ে বানরের পরে ক্রমান্বয়ে হয়েছে।

সমাধান — এই বিষয়ে আমি কিছু সময় আগে লেখা আমার একটি প্রবন্ধ **'বিকাশবাদের বৈদিক সিদ্ধান্ত'** উদ্ধৃত করছি —

সৃষ্টি ও মানুষের উৎপত্তি বৈজ্ঞানিক জগতের কাছে কৌতূহলের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। চার্লস ডারউইনের বিকাশবাদের পরিকল্পনার পর থেকে এর সমর্থন ও বিরোধ — উভয় পক্ষেরই তর্ক-বিতর্ক চলে আসছে। বিকাশবাদীর ধারণা অনুযায়ী, অ্যামিবা থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত শৃঙ্খলাটি হল ক্রমবিকাশের ফল, যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পরিস্থিতির অনুকূলে কিছু

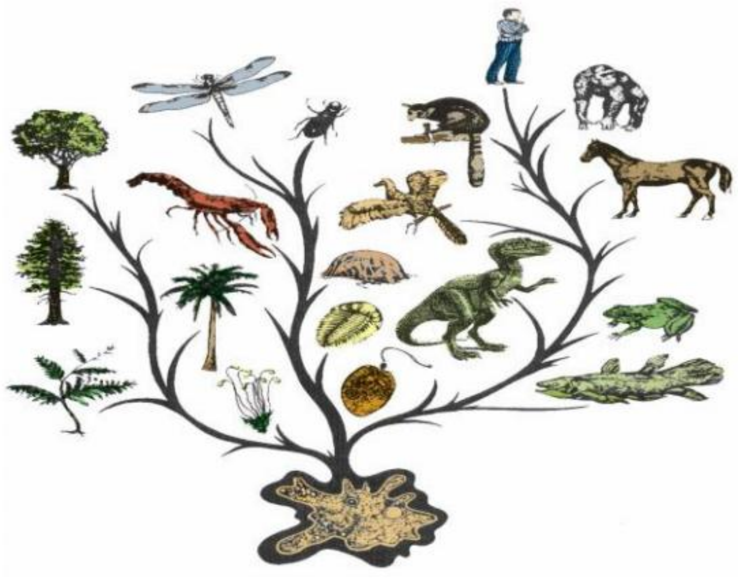

পরিবর্তন হতে-হতে সেগুলো থেকে নতুন-নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে এই বিচারধারা অনুযায়ী, মানুষ ও অন্যান্য পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ সবারই পূর্বপুরুষ এক ছিল এবং আধুনিক বানর হল মানুষের নিকটতম সম্বন্ধী। বিভিন্ন প্রজাতির নানা অঙ্গের বিকাশ প্রয়োজনের নিরিখে আপনা-আপনি হতে থাকে, অর্থাৎ এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে কোনো বিকৃতির কারণে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। এই বিকাশবাদের বিরুদ্ধেও অনেক বিদেশি বিজ্ঞানী সময়ে-সময়ে অনেক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। শারীরিক বিকাশ, বৌদ্ধিক বিকাশ এবং ভাষার বিকাশ, এই তিনটি বিষয়েই বিকাশবাদের বিরোধী বিদেশি বিজ্ঞানীরাও অনেক গম্ভীর প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু বিকাশবাদীরা কখনোই এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারেননি। এদিকে ভারতে **মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী** এবং তাঁর পরবর্তী ও অনুগামী অনেক বিদ্বানরা বিকাশবাদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন, তবুও ডারউইনের বিকাশবাদ আজ কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিজ্ঞানীদের কাছে একটি আদর্শ সিদ্ধান্ত হয়ে আছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী **শ্রীমান ডাঃ সত্যপাল সিং-এর বক্তব্য যে, 'আমরা সবাই বানরের সন্তান নই, বরং মানুষেরই সন্তান', তাতে এই মহানুভবরা শোরগোল করতে-করতে তাঁর ওপর চতুর্দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে দেন।** দেশের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলো সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। আমিও সোশ্যাল মিডিয়ার

মাধ্যমে তাঁদের অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিদ্বান আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি বরং কিছু মহানুভব আবোলতাবোল প্রলাপ বকেছেন। এই মহানুভব ব্যক্তিদের যেকোনো দেশি অথবা বিদেশি বৈজ্ঞানিক অথবা চিন্তাবিদের এই বক্তব্য একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় যে আমরা মানুষেরই সন্তান ?

আমার প্রশ্নের উত্তরে যারা কেবল আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, সেই মহানুভব ব্যক্তিদের জন্য আমি বৈদিক বিকাশবাদের ওপর আমার সংক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনা উপস্থাপন করছি।

বস্তুতঃ **'বিকাশবাদ'** শব্দটির ওপর বিচার করলে দেখা যায় এই শব্দটি অত্যন্ত উত্তম ও সার্থক, কিন্তু ডারউইন এবং তাঁর সমর্থকরা এই শব্দটির সঠিক অর্থ বুঝতে পারেননি এবং নিজের অবৈজ্ঞানিক মতকে 'বিকাশবাদ' বিশেষণে বিভূষিত করার প্রয়াস করেছেন। আমরা যদি সমগ্র সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব সহকারে বিচার করি, তবে স্পষ্ট হয় যে সমগ্র সৃষ্টি এবং তার প্রতিটি উৎপন্ন পদার্থ বিকাশের সিঁড়ি বেয়েই — বর্তমান রূপে আজ দেখা যাচ্ছে। ক্রমাগত বিকাশ ছাড়া প্রাণীজগতের কথা ছেড়েই দিন, কোনো লোক-লোকান্তর বা একটি কণা, ফোটন আদিও কখনো তৈরি হতে পারতো না। **বৈদিক বিজ্ঞান বিকাশবাদের বিশদ ব্যাখ্যা করে, কিন্তু আমাদের বিকাশবাদ ডারউইনের বিকাশবাদ মোটেও নয়। ডারউইনের বিকাশবাদ মূলতঃ বিকাশবাদ নয়, বরং অনিয়ন্ত্রিত ও বুদ্ধিহীন যদৃচ্ছায়াবাদ (খামখেয়ালিপনা), যাকে ভুলবশত বৈজ্ঞানিক বিকাশবাদ নাম দেওয়া হচ্ছে।**

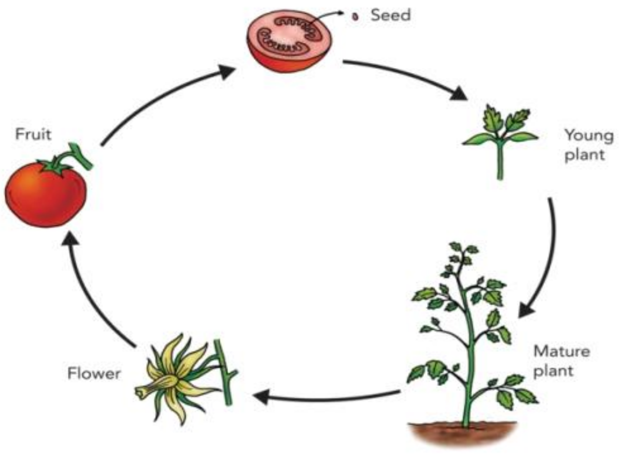

প্রকৃতপক্ষে **বিকাশের অর্থ হল, বীজ থেকে অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে চারাগাছ ও তা থেকে ফুল, ফল এবং পুনরায় বীজের উৎপত্তি হওয়া।** আজ বিজ্ঞান যাদের মূল কণা মনে করছে, সেই কোয়ার্ক এবং ফোটনও বাস্তবে মূল পদার্থ নয়। সেগুলোও সূক্ষ্ম রশ্মিসমূহকে ঘনীভূত করার রূপ অর্থাৎ সেই রশ্মিগুলোর নানা সম্প্রদায়ের বিকশিত রূপ। যে String theorist এই কণাগুলোকে সূক্ষ্ম Strings দ্বারা নির্মিত মনে করেন, সেই Strings-ও মূল তত্ত্ব নয়, বরং সেগুলো হল বৈদিক রশ্মির ঘনীভূত ও বিকশিত রূপ। Strings ও কণা বা ফোটনের বিকাশ

সম্পর্কে বর্তমান বিজ্ঞান অজ্ঞ আছে। জীববিজ্ঞানীরা যে অ্যামিবাকে সবচেয়ে ছোট একক মনে করেন অথবা তার ভেতরে বিদ্যমান ক্রোমোজোম, জিনস্, ডি.এন.এ. আদিকে সূক্ষ্মতম পদার্থ মনে করেন, তারা জানেন না যে, **যেখানে তাদের জীববিজ্ঞান সমাপ্ত হয়ে যায়, সেখান থেকে ভৌতিক বিজ্ঞান শুরু হয় এবং যেখানে বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞান সমাপ্ত হয়ে যায়, সেখান থেকে বৈদিক ভৌতিক বিজ্ঞান শুরু হয় এবং যেখানে বৈদিক ভৌতিক বিজ্ঞানের সীমা সমাপ্ত হয়ে যায়, সেখান থেকে বৈদিক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান শুরু হয়।** আজ বিড়ম্বনা এটাই যে বৈদিক ভৌতিক বিজ্ঞান এবং বৈদিক আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বা তার উপহাস ও বিরোধিতা করে ভৌতিক বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান আদির সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটাও একটি দুঃখজনক সত্য যে, বিশ্বকে বৈদিক ভৌতিক বিজ্ঞানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মতো মানুষই বা আজ কোথায় ? এই কারণে বর্তমান বিজ্ঞান অনেক সমস্যায় জর্জরিত এবং একটি সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও অনেক নতুন সমস্যা তৈরি করে ফেলে। একটি প্রযুক্তি আবিষ্কার করতে গিয়ে বিভিন্ন রকম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও তৈরি করে ফেলে, যেমন ওষুধের উন্নয়নের সাথে-সাথে রোগও ক্রমাগত বাড়ছে, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি অপরাধ এবং পরিবেশ দূষণকেও সমৃদ্ধ করে চলেছে। এই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ হল বর্তমান বিজ্ঞানের অপূর্ণ জ্ঞান, যার কারণ বৈদিক জ্ঞানকে উপেক্ষা করাই। অস্তু।

আমরা আলোচনা করছিলাম যে সৃষ্টির প্রতিটি কথিত মূলকণা ও ফোটন সূক্ষ্ম বৈদিক রশ্মির অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ সংযোগে তৈরি। সেই রশ্মিগুলো মহতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব, কাল ও প্রকৃতির সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়। **সবার পেছনে সর্বনিয়ন্ত্রক, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, নিরাকার, সর্বজ্ঞ চেতন সত্তা ঈশ্বরের প্রেরণা রয়েছে।** সৃষ্টির সর্বাধিক সূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকৃতি থেকে শুরু করে বর্তমান মূলকণা পর্যন্ত বিকাশের যাত্রা অত্যন্ত দীর্ঘ ও সুশৃঙ্খল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, যা সম্পর্কে বর্তমান ভৌতিক বিজ্ঞানীদের বিশেষ জ্ঞান নেই। মূলকণা ও ফোটনের উৎপত্তি থেকে শুরু করে নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের নির্মাণ পর্যন্ত বিকাশের যাত্রা এখানে আলোচনা করা উচিত হবে না। যদিও বর্তমান Cosmology, Particle Physics, Astrophysics, Quantum field theory, String theory -র মতো বিভিন্ন শাখা এই বিষয়গুলোকে নিজস্ব সীমার মধ্যে ব্যাখ্যা করে। আমার বিষয়ও হল এই পদার্থগুলোর ওপর গভীর আলোকপাত করা। জীববিজ্ঞান আমার বিষয় নয়, তবুও বর্তমান অন্ধ কোলাহলের মাঝে কিছু যুবকের আগ্রহে আমি আমার কথা ভৌতিক

বিজ্ঞানের গভীরতা ছেড়ে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের উৎপত্তির ওপরই কেন্দ্রিত করছি।

যখন পৃথিবীর মতো কোনো গ্রহ তার নক্ষত্র থেকে পৃথক হয়, কিংবা নক্ষত্র ওই গ্রহগুলো থেকে পৃথক হয়ে দূরে চলে যায়, তখন সেই গ্রহের স্বরূপ আগ্নেয় (উত্তপ্ত) থাকে। ধীরে-ধীরে সেই আগ্নেয় রূপ ঠান্ডা হয়ে দ্রবীয় রূপে পরিণত হতে থাকে এবং সেই সময় উৎপন্ন জলীয় বাষ্প ধীরে-ধীরে ঠান্ডা হয়ে বৃষ্টি হওয়ার ফলে পৃথিবীতে জল ভরতে শুরু করে। যে অংশ জলের বাইরে থাকে, সেখানে জীবনের উৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্ব অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, D.N.A., R.N.A., ফ্যাট, অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন, জল আদি বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া নিরন্তর চলতে থাকার কারণে উৎপন্ন হতে থাকে। এগুলোর উৎপত্তিতে সহস্র বছর সময় লাগে। এই সব পদার্থ এই পৃথিবীতে যত্রতত্র দ্রব ও গ্যাস রূপে ভরে যায়। সদ্য উৎপন্ন সাগরগুলোতেও এই পদার্থগুলো উৎপন্ন হয়ে যায়। এগুলোর পুনরায় অগ্রিম বিকশিত ও সংযুক্ত রূপ থেকে এককোষী উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়। **বিভিন্ন অ্যাটম ও ক্ষুদ্র মলিকিউল-সমূহের বিশিষ্ট ও বুদ্ধিদীপ্ত সংযোগ থেকে উদ্ভিদ কোষের উৎপত্তি হল একটি অত্যন্ত রহস্যময় ও সুব্যবস্থিত প্রক্রিয়া। এটি সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, সূক্ষ্ম রশ্মি থেকে শুরু করে উদ্ভিদ কোষ তৈরির হাজার-হাজার ধাপের সঞ্চালন কোনো আকস্মিক (ইচ্ছামতো) প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয় এবং এই সব কিছু উদ্দেশ্যহীন ও অনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়াও নয়; বরং এটি হল ঈশ্বরতত্ত্ব দ্বারা বুদ্ধিপূর্বক প্রেরিত, নিয়ন্ত্রিত ও একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া।** প্রতিটি কোষের গঠন মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এতে কোটি-কোটি সূক্ষ্ম কণার এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক সংযোগ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রতিটি কণা হল শত-শত সূক্ষ্ম বৈদিক রশ্মির বিশেষ সংযোগে বিকশিত রূপ। এই কারণে সর্বত্র চেতন শক্তির অনিবার্য ভূমিকা রয়েছে। এটি ছাড়া এই প্রক্রিয়া এক ধাপও এগিয়ে যেতে পারে না। এটিও মনে রাখা প্রয়োজন যে জল, বায়ু, ভূমি এবং এদের মধ্যে বা এদের দ্বারা বিভিন্ন জীবনীয় তত্ত্ব তৈরির পর সর্বপ্রথম উদ্ভিদেরই উৎপত্তি হয়। উদ্ভিদ কোষের উৎপন্ন হওয়ার জন্য, তার বেঁচে থাকার জন্য এবং তার বিকাশের মাধ্যমে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্ব আগেই তৈরি হয়; তার পরেই উদ্ভিদ কোষের জন্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে। প্রাণী কোষ উদ্ভিদের জন্মের পরেই উৎপন্ন হয়। এর কারণ হল সকল জীবজন্তু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল। মাংসাশী প্রাণীরাও তৃণভোজী প্রাণীদের ওপর নির্ভর করে। **এই কারণে উদ্ভিদের উৎপত্তির পরেই প্রাণী জগতের উৎপত্তি এককোষী জীব থেকেই শুরু হয়।** উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও সরল থেকে জটিল

কাঠামোর উদ্ভিদের ক্রমিক উৎপত্তি ঘটে। **ক্রমিক উৎপত্তির অর্থ এই নয় যে শৈবাল বিকশিত হয়ে বটগাছ বা অশ্বত্থ, আম ও বাবলা বা বাদাম গাছের রূপ নিবে।** একইভাবে এককোষী জীব অ্যামিবার উৎপত্তি ভূমি বা জলে হয়, কিন্তু **কোনো জীব তা এককোষী হোক বা বহুকোষী, তা কেবল কিছু পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ মাত্র নয়, বরং তার মধ্যে সূক্ষ্ম চেতন তত্ত্ব জীবাত্মারও সংযোগ থাকে।** সম্পূর্ণ সংযোগই জীবের রূপ হয়। বর্তমান বিজ্ঞানও রাসায়নিক সংযোগ থেকে কোষের উৎপত্তি স্বীকার করে—

A very important step the formation of a cell must have been the development of lipid mambrane. In order that biological systems can function efficiently, it is essential that the enzymes connected with successive stages of synthesis of biochemical pathway should be in a close a proximity to one another. The necessary conditions for this are obtained in cells by means of lipid manbranes which can maintain local high concentration of reactants. The presence of hydrocarbons early in the earth's history has already been mentioned....

Life requires for its maintenance a continous supply of energy this could have been provided by ultraviolate or visible light from the sun, or possibly partly from the break down of unstable free radiations produced in the earth's atmosphere by ultraviolate light. [Cell Biology, page 474 by E.J. Ambrose & Dorothy M. Easty, London -1973]

সারমর্ম হল, এই পৃথিবীতে রাসায়নিক ও জৈবিক বিক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের এনজাইম নির্মাণ হয়ে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ তৈরি হয়েছিল। এর পাশাপাশি অনেকত্র রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমেই কোষের প্রাচীর এবং জীব দ্রব্যাদির নির্মাণ এই ভূমিতে হয় তথা সেই কোষগুলোকে ক্রমাগত পুষ্টি জোগানোর কাজ পৃথিবীতে উপস্থিত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ এবং সূর্যের আলো করেছে।

কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন যে, পৃথিবীতে জীবন অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে; তাদের কাছে আমি জানতে চাইবো যে, যদি অন্য কোনো গ্রহে জীবনের উৎপত্তি হতে পারে, তবে এই পৃথিবীতে কেন হতে পারে না? প্রকৃতপক্ষে, এই ধরণের চিন্তা সম্পূর্ণ অপরিণত ভাবনার

ফলাফল। বর্তমান সময়ের কিছু বিজ্ঞানীও এই ধারণার সাথে একমত নন। তারা বলেন —

The view the life did infact originate on the earth itself after it had cooled over a period of many thousands of years is almost universally accepted today.

[Cel Biology, page-474]

যে বিজ্ঞানীরা অ্যামিবা থেকে বিকশিত হয়ে অর্থাৎ এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতির উৎপন্ন হওয়ার কথা বলেন, তারা এটি ভাবেন না যে উদ্ভিদ বা প্রাণী — কারোর মধ্যেই এই ধরণের পরিবর্তন সম্ভব নয় এবং এর কোনো প্রয়োজনও নেই। আমি এখানে বিজ্ঞানীদের কাল্পনিক ও মিথ্যা বিকাশবাদ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তুলবো না, কারণ আমি এর আগে এটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুলেছি। যারা ডারউইনের বিকাশবাদের বিস্তারিত পর্যালোচনা চান, তাদের আর্য বিদ্বান পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্মা রচিত **'বৈদিক সম্পত্তি'** নামক গ্রন্থটি পড়া উচিত। তাছাড়া, **যখন রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে অ্যামিবার উৎপত্তি হতে পারে, তখন বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর উৎপত্তি একইভাবে কেন হতে পারে না ?** যখন 500-র বেশি ক্রোমোজোম বিশিষ্ট অ্যামিবা রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হতে পারে, তখন বানর, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং যাদের 48-48টি ক্রোমোজোম থাকে, 46টি ক্রোমোজোম বিশিষ্ট মানুষের নারী ও পুরুষের 23-23টি ক্রোমোজোম যুক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর উৎপত্তি অ্যামিবার মতো কেন হতে পারে না ? মানুষের সমান ক্রোমোজোম বিশিষ্ট Sable Antelope নামক হরিণ সদৃশ পশু এবং Reaves's Muntjac নামক হরিণের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু এবং 56টি ক্রোমোজোম বিশিষ্ট হাতির শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কেন উৎপন্ন হতে পারে ? একটি পিঁপড়ে, যার মাত্র 2 টি ক্রোমোজোম থাকে, সে কেন উৎপন্ন হতে পারে ?

এখানে বৈদিক মত হল, **যে জীবের জীবনধারণের জন্য যত কম পদার্থের প্রয়োজন হয়, সেই জীব তত আগে উৎপন্ন হয়েছে।** সকল প্রাণীর পূর্বে উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে এবং মাংসাশী প্রাণীদের পূর্বে তৃণভোজী প্রাণীদের জন্ম হয়েছে। তৃণভোজীদের মধ্যে মানুষ এমন এক প্রাণী যাকে সবথেকে বিকশিত বা উন্নত ধরা যেতে পারে এবং সে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল, এই কারণেই তার উৎপত্তি হয়েছে সবার শেষে।

এখন প্রশ্ন জাগে যে, মাদা (মাতা) ছাড়াই ভ্রূণের বিকাশ কীভাবে হয় ? শুক্রাণু ও ডিম্বাণু না হয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে মাটি বা জলে উৎপন্ন হল, কিন্তু শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিষেক

(Fertilization) এবং ভ্রূণের বিকাশ কোথায় ও কীভাবে হল? এই বিষয়ে মানুষের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে **মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর 'সত্যার্থ প্রকাশ' নামক গ্রন্থে**

যুবাবস্থায় ভূমি থেকে উৎপত্তির কথা বলেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, যদি শিশু অবস্থায় উৎপত্তি হতো, তাহলে তাদের রক্ষা ও পালন কে করতো? আর যদি বৃদ্ধ অবস্থায় উৎপন্ন হতো, তাহলে বংশ পরম্পরা কীভাবে চলতো? এই কারণে মানুষ যুবাবস্থাতেই ভূমি থেকে উৎপত্তি হয়।

যদিও এই বিষয়ে তিনি কোনো প্রমাণ দেননি, তবে আমি ঋগ্বেদে এই বিষয়ে প্রমাণ পেয়েছি, যেখানে লেখা আছে —

উপ সর্প মাতরম্ ভূমিমেতামুরুব্যচসম্ পৃথিবীম্ সুশেবাম্।
ঊর্ণম্রদা যুবতিদক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নির্ঋতেরুপস্থাৎ ॥ (10.18.10)

এর ওপর আমার আধিভৌতিক ভাষ্য — হে জীব! **(সুশেবাম্) {সুশেবঃ সুসুখতমঃ- নিরুক্ত 3.3}** উত্তম সুখ প্রদানে সর্বশ্রেষ্ঠ **(এতাম্)** এই **(মাতরম্)** মাতার সমান **(ভূমিম্)** শুরুতে যার গর্ভে সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়েছিল বা যার ওপর সমস্ত প্রাণী বাস করে, সেই পৃথিবী **(উরু-ব্যচসম্)** অত্যন্ত বিস্তার লাভ করে সকল ভ্রূণের **(উপ সর্প)** নিকটবর্তী প্রাপ্ত হয়, একইসাথে সেই গর্ভের অভ্যন্তরীণ আবরণ ক্রমাগত স্পন্দিত হতে থাকে। **(ঊর্ণম্রদা) {ঊর্ণম্রদা ইত্যূর্ণমৃদ্বীতৈবৈতদাহ — কাশ. 4.2.1.10, সাধবী দেবেভ্য ইত্যেবৈতদাহ য়দাহোর্ণম্রদসম্ ত্বেতি — শ. 9.3.3.11}** সেই ভূমি ওই ভ্রূণগুলোকে এমন ভাবে আবরণ প্রদান করে, যা পশমের মতো কোমল, মসৃণ ও আরামদায়ক হয়। সেটি ওই দিব্য ভ্রূণকে চারদিক থেকে গর্ভের মতো সুখদ স্পর্শযুক্ত ঘর প্রদান করে। **(যুবতিঃ)** সেই গর্ভরূপ পৃথিবীতে

বিভিন্ন জীবনী রসের মিশ্রণ-অমিশ্রণের ক্রিয়া নিরন্তর চলতে থাকে। **(দক্ষিণাবতঃ)** সেই পৃথিবী ওই ভ্রূণগুলোকে ততক্ষণ পর্যন্ত পুষ্টি প্রদান করতে থাকে, যতক্ষণ না তারা নিজেদের লালন ও রক্ষা করতে পূর্ণ দক্ষ অর্থাৎ সক্ষম না হয়ে ওঠে। **(এষা)** এই ভূমি **(ত্বা)** তুমি জীবকে **(নির্ঋতেঃ-উপস্থাত্) {নির্ঋতির্নিরমণাৎ ঋচ্ছতেঃ কৃচ্ছ্রাপত্তিরিতরা — নিরু. 2.8}** পূর্ণরূপে নিরন্তর সানন্দ রমণ করে, এমন সুরক্ষিত ও উত্তম স্থানে **(পাতু)** ওই ভ্রূণ বা জীবদের পালন করে। এর সাথে-সাথে যেখানে ক্লেশ পৌঁছাতে পারে, এমন অসুরক্ষিত স্থান থেকে সেই ভূমির গর্ভরূপ আবরণ ওই জীব বা ভ্রূণকে রক্ষা করে।

উচ্ছ্বঞ্চস্ব পৃথিবী মা নি বাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবঞ্চনা।
মাতা পুত্রম্ য়থা সিচাভ্যেনম্ ভূম ঊর্ণহি॥ (ঋ. 10.18.11)

আমার আধিভৌতিক ভাষ্য — (পৃথিবি) সেই গর্ভরূপ পূর্বোক্ত পৃথিবী **(উচ্ছ্বঞ্চস্ব)** উৎকৃষ্টরূপে ঊর্ধ্ব দিশায় স্পন্দিত বা উথলিত হয়। **(মা বাধথাঃ)** সেই ভূমির আবরণ এমন হয় যা তার ভেতরে বেড়ে ওঠা ভ্রূণ বা জীবের কাছে পৌঁছানো জীবনী রসকে বাধা দেয় না, অর্থাৎ সেগুলো চুইয়ে-চুইয়ে ওই জীবের কাছে পৌঁছাতে থাকে। **(অস্মৈ)** সেটি এই জীবনের জন্য **(সূপায়না-ভব)** সেই ভূমি তাকে পোষক ও সংবর্ধক জীবনী তত্ত্বের উপহার প্রদান করে। **(সূপবঞ্চনা) {উপবঞ্চনম্ = ডুব দেওয়া/লুকিয়ে রাখা- আপ্টে}** সেই ভূমি আবরণ ওই ভ্রূণ বা জীবদের ভালোভাবে লুকিয়ে আশ্রয় প্রদান করে। **(মাতা য়থা)** যেভাবে মা নিজের সন্তানকে কোলে বা গর্ভে ঢেকে সুরক্ষা প্রদান করেন, ঠিক সেভাবেই **(নি-সিচা ভূমেঃ) {নি+সিচ্ = উপরে ঢেলে দেওয়া, গর্ভযুক্ত করা- আপ্টে}** ভূমির সেই অংশগুলো ওই জীবদের নিজের গর্ভে নিয়ে তাদের উপরে বিভিন্ন আবরণ দ্বারা**(এনম্)** সেই জীবগুলোকে **(অভি ঊর্ণহি)** সবদিক থেকে আচ্ছাদিত করে ফেলে।

উচ্ছ্বঞ্চমানা পৃথিবী সু তিষ্ঠতু সহস্রম্ মিত উপ হি শ্রয়ন্তাম্।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্ত্বত্র॥ (ঋ. 10.18.12)

আমার আধিভৌতিক ভাষ্য — (উচ্ছ্বঞ্চমানা) পূর্বোক্ত স্ফীত এবং মৃদু স্পন্দনরত কোমল **(পৃথিবী)** ভূমি **(সু তিষ্ঠতু)** সেই ভ্রূণ বা জীবদের আচ্ছাদনকারী হয়ে দৃঢ়তা ও নিরাপত্তার সাথে স্থিত হয়ে সেই জীবদের স্থায়িত্ব প্রদান করে। **(সহস্রম্ মিতঃ)** সেই ভূমির পৃথক-পৃথক স্থানে অনেক সংখ্যায় **(উপ হি শ্রয়ন্তাম্)** জীবেরা নিকটবর্তী হয়ে আশ্রয় পায় অথবা সেই গর্ভরূপ

স্থানগুলোতে বিপুল সংখ্যায় **{মিতঃ = মিনোতিগতিকর্মা — নিঘন্টু 2.14}** বিভিন্ন সূক্ষ্ম অণুসমূহের প্রবাহ বজায় থাকে। **(তে গৃহাসঃ)** ভূমির সেই স্থানগুলো সেই জীবদের জন্য ঘরের সমান হয় **{গৃহাম্ = গৃহাঃ কস্মাদ্ গৃহ্ণাতীতি সতাম্— নিরু. 3.13}** এবং ঘরের মতো ভূ-কোষ্ঠগুলো সেই জীবদের এমনভাবে ধরে রাখে, যেমন মা নিজের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে রাখেন। **(ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু)** সেই ভূ-কোষ্ঠগুলো এমন হয় যে সেগুলোতে ঘিয়ের মতো মসৃণ রস সর্বদা চুঁইয়ে পড়তে থাকে। **(অস্মৈ)** তা সেই জীবদের জন্য **(বিশ্বাহা)** **{বিশ্বাহা = সর্বাণি দিনানি— ম. দ. য়জু. ভা. 7.10}** সর্বদা অর্থাৎ পূর্ণ যৌবনকাল পর্যন্ত **(শরণাঃ সন্তু অত্র)** এই অবস্থায় সেই জীবরা ওই কোষ্ঠগুলোতে আশ্রয় পায়।

এই মন্ত্রগুলোতে মাটির নিচে যৌবনকাল পর্যন্ত কীভাবে মানুষসহ সকল জরায়ুজ প্রাণী বিকশিত হয়, তার সুন্দর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

যেভাবে অ্যামিবা আদি এককোষী প্রাণীর কোষের নির্মাণ রাসায়নিক ও জৈবিক ক্রিয়াসমূহ দ্বারা হয়, ঠিক সেভাবেই বহুকোষী জরায়ুজ এবং অণ্ডজ প্রাণীদেরও শুক্র তথা রজের নির্মাণ এই স্ফীত ও কোমল এবং সকল প্রয়োজনীয় পদার্থ, যা মায়ের গর্ভে থাকে, তা দ্বারা পরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরিভাগের স্তরগুলোতে হয়ে যায়। এখন আমাদের বিচার করতে হবে যে ভ্রূণের পুষ্টির জন্য মায়ের গর্ভের প্রয়োজনীয়তা কেন হয় ? এই কারণে, যাতে ভ্রূণ প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর পদার্থ পেতে পারে, ভ্রূণ যেন সুরক্ষিত, কোমল ও মসৃণ আবরণ এবং প্রয়োজনীয় উত্তাপ পেতে পারে। যদি এই পরিস্থিতিগুলো মায়ের গর্ভের বাইরে অন্য কোথাও তৈরি করা যায়, তবে ভ্রূণের বিকাশ সেখানেও হবে, ঠিক যেভাবে আজ টেস্ট-টিউব বেবি বা পরখনলি দিয়ে শিশু জন্মগ্রহণ করছে।

তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, **সেই সময়ে মানুষ বা অন্য কোনো জরায়ুজ প্রাণী উদ্ভিদের মতো সরাসরি যুবাবস্থায় ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়।** ভগবদ্ দয়ানন্দ জী মহারাজের এই বক্তব্যটি সর্বথা সঠিক যে— যদি শিশু জন্মাতো তবে তাকে লালন-পালন কে করতো? আর যদি বৃদ্ধরা জন্মাতো তবে বংশবৃদ্ধি কীভাবে হতো ? (দ্রষ্টব্য — সত্যার্থ প্রকাশ, অষ্টম সমুল্লাস)। উপনিষদের ঋষিগণ একে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন —

তস্মাচ্চ দেবা বহুধা সংপ্রসূতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ... (মুণ্ডক উপনিষদ 2.1.7)

অর্থাৎ, সেই পরমাত্মা থেকে অনেক বিদ্বান, সিদ্ধিপ্রাপ্ত জন তথা সাধারণ বিদ্বান জন উৎপন্ন হয়েছে।

সত্যার্থ প্রকাশ — উদীয়মান প্রশ্ন গর্জনশীল উত্তর

আর্য বিদ্বান **আচার্য বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী** তাঁর **'বৈদিক যুগ ও আদিমানব'** গ্রন্থে আমেরিকার বোস্টন শহরের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডক্টর ক্লার্কের একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন —

Man appeared able to think, walk and defend himself. অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টির আদিকালে চিন্তা করতে, হাঁটতে এবং নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম অবস্থায় জন্মায়।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, পৃথিবী রূপী গর্ভে পঁচিশ বছর ধরে একজন যুবক কীভাবে বড় হয়ে উঠলো এবং বিকশিত হল ? তবে এই বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলে কোনো আপত্তি দেখা যায় না। কারণ, ঠিক যেভাবে আজও একটি শিশু প্রায় 9 মাস মায়ের গর্ভে থাকে; জন্মের আগে সে শ্বাস নেয় না, হাত-পা নাড়ে না, খায় না, পান করে না, মল-মূত্র ত্যাগ করে না, অথচ জন্মের পরপরই তার মধ্যে এই সমস্ত ক্রিয়া সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হয়ে যায়। তাহলে এটি কি এক অদ্ভুত বিষয় নয়, আশ্চর্যজনক নয় ? যদি কোনো ব্যক্তিকে এই সমস্ত কিছু থেকে দূরে রাখা হয় এবং সে যদি এই প্রসব প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞানী হয়, তবে সে এই প্রসব প্রক্রিয়াকে অসম্ভব বলে মনে করবে। যদি সে কেবল অণ্ডজদের (ডিম থেকে জন্ম নেওয়া প্রাণী) জন্মই দেখে থাকে, তাহলে সে জরায়ুজদের প্রসব প্রক্রিয়াকে অণ্ডজদের থেকে ভিন্ন মানতে রাজি হবে না। তাই যুবাবস্থায় প্রাণীদের উৎপত্তি অসম্ভব নয়; তবে অদ্ভুত অবশ্যই। তারপর এত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার জটিলতা, ক্রমবদ্ধতা, বৈজ্ঞানিকতা কি অদ্ভুত নয় ? তাহলে যুবাবস্থায় প্রাণীর উৎপত্তি কোথায় বিচিত্র রয়ে যায় ?

এটিও জানা প্রয়োজনীয় যে, যেভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমি রূপী মাতার গর্ভে প্রাণীদের উৎপত্তি হয়ে সমস্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং স্বেদজ একইভাবে ভূমির স্তরে উদ্ভিদের মতো যুবাবস্থায় জন্ম নিয়েছে; একইভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভিদের বীজ ভূমির স্তরে তৈরি হয়ে এবং প্রয়োজনীয় পোষক পদার্থ পৃথিবীতেই পেয়ে যাওয়ার ফলে যত্র-তত্র চারাগাছ, বনস্পতি বা বিশালকায় বৃক্ষ পূর্বেই উৎপন্ন হয়েছিল। যেভাবে কোনো প্রাণী উৎপন্ন হয়, তার খাদ্য সে তৎক্ষণাৎ ভূমিতে তৈরি পায়। মানুষের অনেক নর-নারী জোড়া যুবাবস্থায় ভূমিতে প্রকট হয়েছিল; সেই সময় তারা পৃথিবীকে ফল, ফুল ও অন্নাদিতে পরিপূর্ণ অবস্থায় পেয়েছিল এবং তারা ভূমি থেকে বের হয়ে তৎক্ষণাৎ ফলমূল সেভাবে খেতে শুরু করেছিল, যেভাবে আজ শিশু (মানুষ বা গরু আদি পশু) জন্ম নেওয়ার সাথে-সাথেই মায়ের দুগ্ধ পান

করতে শুরু করে। এতে কোনো সন্দেহ বা শঙ্কার অবকাশ নেই।

এটি আমি সংক্ষেপে মানুষের উৎপত্তি বিষয়ে লিখলাম। **আমি বড়ই আশ্চর্য হই যে, চার্লস ডারউইনের পর তাঁর পুত্রসহ অনেক ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরাও এই মিথ্যা বিকাশবাদকে খণ্ডন করেছেন, কিন্তু পাশ্চাত্যের দাস হয়ে যাওয়া তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্কে এখনো চার্লস ডারউইন ভূত বসে আছে।**

এখন আমি সংক্ষেপে **পণ্ডিত রঘুনন্দন শর্মা** দ্বারা লিখিত পুস্তক **'বৈদিক সম্পত্তি'** থেকে কিছু বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারাও উদ্ধৃত করতে চাইবো —

স্যার অলিভার লজ লিখেছেন — We are in the process of evolution; we have arrived in this planet by evolution. That is all right. What is evolution ? Unfolding development-unfolding as a bud unfolds into a flower, as an acron into an oak. Everything is subject to a process of growth, of development, of unfolding. অর্থাৎ আমরা সবাই বিকাশেরই অধীন। আমরা বিকাশের মাধ্যমেই এই পৃথিবীতে এসেছি। এই সবই সত্য, কিন্তু বিকাশ কী ? বিকাশ হল নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি। নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ কুঁড়ি থেকে ফুল হওয়ার নিয়ম — বীজ থেকে বৃক্ষ হওয়ার পথ। প্রত্যেকটি পদার্থ কুঁড়ি থেকে ফুলের মতো নিরবচ্ছিন্ন উন্নতিরই ফল। (Science and Religion, p.16) (বৈ. সম্পত্তি পৃ. 150)

There is manifest progress in the succession of being on the surface of the earth. This progress consists in an increasing similarity of the living fauna, and among the vertebrates especially, in their increasing resemblance to man .... But this connection is not the consequence of a direct linkage between the fauna of different ages. There is nothing like parental descent connecting them. The fishes of the Palaeozoik age are in no respect the ancestors of the reptiles of the secondary age, nor does man descend from the mammals which preceded him in the Tertiary age. The link by which they are connected is of a higher and immaterial nature and Himself, whose aim in forming the earth, in allowing it to undergo successively all the different types of animals which have passed away, was to introduce man upon the surface of our globe. Man is the end towards which all the animal-creation has tended from the first

appearance of the Palaeozoic fishes. অর্থাৎ পৃথিবীতে উৎপন্ন হওয়া হাড়হীন প্রাণী এবং মনুষ্যাদি হাড়যুক্ত প্রাণীদের মধ্যে এক সমান উন্নতিই দেখা যায়। কিন্তু এই সমানতার অর্থ এই নয় যে, এক ধরণের প্রাণী অন্য ধরণের প্রাণী থেকেই বিকশিত হয়েছে। আদিমকালীন মাছ সরীসৃপ প্রাণীদের পূর্বপুরুষ নয় এবং মানুষও অন্য কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী থেকে বিকশিত হয়নি। প্রাণীদের শৃঙ্খলা কোনো এক অভৌতিক তত্ত্বের সাথে সম্বন্ধ রাখে, যেটি পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর সৃষ্টি করে শেষে মানুষের রচনা করেছে। — Principles of Zoology, Pg. 205-206, **Agassiz** (বৈ. সম্পত্তি পৃ. 150-151)

How did living creatures begin to be upon the earth? In points of science, we do not know. অর্থাৎ বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা জানি না যে পৃথিবীতে জীবধারী প্রাণীদের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে। — Introduction to Science, Pg. 142 by **J.A. Thomson** (বৈ. সম্পত্তি পৃ. 152)

The question is : what was the manner of their being upon the previously tenantless Earth ? Our answer must be that we do not know. অর্থাৎ এই জনমানবহীন পৃথিবীতে প্রাণী কীভাবে উৎপন্ন হলো ? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি যে আমরা জানি না। — Evolution, Pg. 70 by **Prof. Patrick Geddes** (বৈ. সম্পত্তি পৃ. 152)

নভেম্বর 1922 সালে New Age নামক পত্রিকায় Jones Bowson বলেন যে, ''ব্রিটিশ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ **ডক্টর ইথ্রিজ** বলেছেন — এই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এমন একটি কণাও নেই যা প্রমাণ করতে পারে যে প্রজাতির (Species) পরিবর্তন হয়েছে। বিকাশ সংক্রান্ত দশটি কথার মধ্যে নয়টি কথাই অর্থহীন ও অসার। এদের পরীক্ষার ভিত্তি সত্যতা এবং পর্যবেক্ষণের ওপর একেবারেই নির্ভরশীল নয়। সারা পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই যা বিকাশকে সমর্থন করে।'' (বৈ. সম্পত্তি পৃ. 170)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় **'ক্রিশ্চিয়ান হেরাল্ড'** (Christian Herald)-এ সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল যে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ব্রিটিশ সায়েন্স সোসাইটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। **প্রফেসর উইলিয়াম ওয়াটসন** এর সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে, 'ডারউইনের বিকাশবাদ একেবারেই অসত্য এবং বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ।' অন্য বক্তাগণ সাময়িক যুদ্ধের দিকে সংকেত করে বলেন যে, 'এই যুদ্ধ এই কথারই প্রমাণ যে মানুষ আগে যেমন ছিল, এখনো তেমনই আছে।' **প্রফেসর প্রেট্রিকগেডিস** বলেন যে, For it must b e admitted

that the factors of the evolution of man partake largely of the nature of the may-be's which has no permanent position in Science. অর্থাৎ, এটি স্বীকার করতেই হবে যে মানুষের বিকাশের প্রমাণ সন্দিগ্ধ আছে আর বিজ্ঞানের জন্য তার কোনো স্থায়ী স্থান নেই। — Ideals of Science and Faith (বৈ. সম্পত্তি পৃ. 212)

স্যার জে. ডব্লিউ. ডায়সন বলেন যে, 'বিজ্ঞান বানর এবং মানুষের মধ্যবর্তী কোনো আকৃতির কিছুই জানে না। মানুষের প্রাচীনতম অস্থিও বর্তমান মানুষের মতোই। এগুলো থেকে সেই বিকাশের কোনো হদিস পাওয়া যায় না, যা এই মানব-শরীরের আগে ঘটেছিল।' (বৈ. সম্পত্তি পৃ. 212)

সিডনি কলেট বলেন যে, 'বিজ্ঞানের স্পষ্ট সাক্ষ্য হল যে, মানুষ অবনত দশা থেকে উন্নত দশার দিকে যাওয়ার পরিবর্তে উল্টো অবনতির দিকে যাচ্ছে। মানুষের আরম্ভিক অবস্থাই শ্রেষ্ঠ ছিল।' (বৈ. সম্পত্তি পৃ. 213)

আচার্য বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী দ্বারা লিখিত **'বৈদিক যুগ ও আদি মানব'** পুস্তকের 11 নং পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত — Now a days unhappily Jelly fish produces nothing but Jelly fish. But had that gelatinous morsel been fated to live. say a million of centuries earlier it might have been the proginitor of the race from which Homer and Plato, Devid and paul, Shakespear and our eminent professor have in their order been evolved. (**Conder's** Natural Selection and Natural Theology)

If it could be shown that the thrush was hatched from the lizard. (**Conder's** same book)

Henri Bergson ফরাসি দার্শনিক Anti Darwin theory দেওয়ার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তবুও আমাদের বুদ্ধিজীবীরা কিছু বুঝতে পারেননি। নেটে অনেকে অন্য বিদেশি বিজ্ঞানীদের Neo Darwinism adi ডারউইন বিরোধী থিওরিগুলোর চর্চা করতে সুধী পাঠক দেখতে পারেন। এদিকে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের আলোচনার প্রসঙ্গে আর্য বিদ্বান **স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী** দ্বারা রচিত **"সত্যার্থ ভাস্কর"** গ্রন্থ (পৃ. 877) উদ্ধৃত করা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে —

উদ্ভিদবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদ্বান **ডাঃ বীরবল সাহনী**-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল— 'আপনি বলেন যে শুরুতে একটি কোষের জীবিত প্রাণী ছিল, তা থেকে উন্নতি করে

বড় বড় প্রাণী তৈরি হয়েছে। আপনি ইহাও বলেন যে শুরুতে খুব কম জ্ঞান ছিল, ধীরে ধীরে উন্নতি হতে হতে জ্ঞান সেই অবস্থায় পৌঁছে গেছে, যাকে বিজ্ঞান আজ পৌঁছে দিয়েছে।' তাহলে আপনি এটা তো বলুন যে— ''Wherefrom did life come in the very beginning and wherefrom did knowledge come in the very beginning?'' অর্থাৎ "শুরুতে জীবন কোথা থেকে এলো এবং শুরুতে জ্ঞান কোথা থেকে এলো ? কারণ জীবন শূন্য থেকে উৎপন্ন হয়ে গেল, এটা মানা যায় না।" **ডাঃ সাহনী** উত্তরে বলেছিলেন, ''এর সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই যে শুরুতে জীবন বা জ্ঞান কোথা থেকে এলো। আমরা এই কথাটি স্বীকার করে চলি যে শুরুতে কিছু জীবনও ছিল এবং কিছু জ্ঞানও ছিল'' —

''With this we are not concerned as to where from life came in the very beginning or wherefrom knowledge came in the very beginning. We are to take it for granted that there was some life in the beginning of the world and there was knowledge also in the beginning of the world and by slow progress it increased.''

এর থেকেও বিকাশবাদের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়ে যায়।

শেষে আমি ভারতেরই নয়, বরং বিশ্বজুড়ে থাকা প্রবুদ্ধ মানুষ ও বিজ্ঞানীদের কাছে নিবেদন করতে চাইবো যে তারা যেন নিজেদের ইতিহাসের ওপর গর্ব করতে শেখেন। আপনারা সবাই এটা তো মানেন ও জানেনই যে বেদ সংসারের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ। আমার এটাও প্রমাণ করার ক্ষমতা আছে যে বেদ হল ঈশ্বরীয় জ্ঞান এবং **বেদ মন্ত্ররূপী ধ্বনি তরঙ্গের মাধ্যমেই সৃষ্টির উৎপত্তি হয়েছে অর্থাৎ যে ধ্বনি তরঙ্গ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে, সেই ধ্বনিগুলোই হল বেদ মন্ত্র এবং বর্তমানেও সেই তরঙ্গগুলো সর্বত্র বিদ্যমান আছে। এটি হল আমার Vaidic Rashmi theory of Universe,** যা এই ব্রহ্মাণ্ডকে বর্তমান ভৌতিকীর তুলনায় অনেক বেশি উন্নত স্তরে ব্যাখ্যা করতে পারে। আমি ঋগ্বেদের মন্ত্রের মাধ্যমেও মানুষের উৎপত্তির আলোচনা এই নিবন্ধে করেছি।

বেদ তথা ঋষিদের মতে, মানুষের প্রথম প্রজন্ম সর্বাধিক বুদ্ধিমান এবং শারীরিক ও মানসিক বল ও সত্ত্বগুণে সমৃদ্ধ ছিল। এরপর তাদের মধ্যে ন্যূনতাই এসেছে, বিকাশ নয়। আমরা সারা বিশ্বের সকল মানুষ সেই মহান পূর্বপুরুষদেরই বংশধর। **বেদ হল আমাদের সবার, ঋষিরা হলেন আমাদের সবার পূর্বপুরুষ। বেদ ও ঋষিদের গ্রন্থের ওপর কেবল মানবজাতিরই**

নয়, বরং ব্রহ্মাণ্ডের সকল বুদ্ধিমান প্রাণীর সমান অধিকার আছে। আসুন, আমরা সবাই এই যৌথ ঐতিহ্যকে গ্রহণ করি, অধ্যয়ন ও গবেষণা করি এবং গর্বের সাথে নিজেদের পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষের বংশধর হিসেবে পরিচয় দিই।

আমি এখানে কেবল জৈব বিকাশবাদ নিয়েই আলোচনা করেছি; জ্ঞান ও ভাষার তথাকথিত ক্রমবিকাশের সমালোচনা অন্য কোনো নিবন্ধে বা পুস্তকে করা যেতে পারে। জৈব বিকাশবাদ নিয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, অন্যথায় এই নিবন্ধটি একটি পৃথক পুস্তকের আকার ধারণ করতো। বিজ্ঞ পাঠকগণ জ্ঞান ও ভাষার বিকাশের পাশাপাশি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অদ্ভুত বিজ্ঞান বোঝার জন্য আমার বিশাল গ্রন্থ **'বেদবিজ্ঞান আলোকঃ'** পড়তে পারেন, যা মোট 2800 পৃষ্ঠায় চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তবে যেতে যেতে একটি কথা লিখে রাখা উচিত বলে মনে করি — যদি কোনো প্রবুদ্ধ ব্যক্তি বলেন যে, যখন সূক্ষ্ম রশ্মিগুলো বিকশিত হয়ে বিভিন্ন কণা, ফোটন এবং বিভিন্ন জগত সৃষ্টি করতে পারে অথবা সেই রূপে প্রকাশ পেতে পারে, তবে অ্যামিবা থেকে মানবদেহের বিকাশকে কেন মিথ্যা বলা হচ্ছে ? এই বিষয়ে আমার নিবেদন হল, জড় জগৎ নির্মাণ বা বিকাশের সময় রশ্মি, কণা বা ফোটন প্রায়ই নিজেদের স্বরূপ বজায় রাখে, কিন্তু কোনো বিকাশবাদী এটি মানবেন না যে বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে অ্যামিবা তার নিজস্ব স্বরূপে অবস্থান করে। এই কারণে এই তুলনা করা উচিত নয়।

আমার মিত্রগণ! একটু ভেবে দেখুন, **যে ব্যক্তি বা সমাজ নিজেকে পশুদের বংশধর বলে, তাদের মধ্যে আত্মসম্মান কোথায় থাকবে ?** এই বিষয়ে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া এক বক্তৃতায় নাসার বিজ্ঞানী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা **প্রো. ও.পি. পাণ্ডে** ডারউইনের বিকাশবাদকে খারিজ করে দিয়ে যথাযথ বলেছেন যে, 'দেশজুড়ে বাচ্চাদের ভুল সিদ্ধান্ত পড়ানো হচ্ছে, যার ফলে তাদের ওপর খারাপ প্রভাব পড়ছে।' (নবভারত টাইমস - 2 ফেব্রুয়ারি 2018)

আসুন, এই দীন-হীনতার গর্ত থেকে বের করে আমি আপনাদের সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে চাই। আসুন, আমরা সবাই এক ঈশ্বরের পুত্র-কন্যা এবং এই পৃথিবীই আমাদের আদি জন্মদাত্রী মা, এই কারণে এই সম্পূর্ণ বিশ্বই একটি পরিবার। এই পরিবারকে সুখ, শক্তি ও আনন্দের দিকে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের সব মানুষের। আমাদের বিজ্ঞানকে খোলা ও উদার মনেই পড়ার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের কুসংস্কার বা পূর্বাগ্রহ থেকে দূরে থেকে সত্য-অসত্যের বিচার করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

শঙ্কা (3) — মহর্ষি দয়ানন্দ জী সত্যার্থ প্রকাশের দশম সমুল্লাসে লিখেছেন যে, 'আর্যদের ঘরে শূদ্ররা যখন রান্না করবে, তখন মুখ বেঁধে রান্না করবে। কারণ তাদের মুখ থেকে উচ্ছিষ্ট ও নির্গত শ্বাস যেন খাবারে না পড়ে।' অষ্টম দিনে নখ কাটাবে এবং স্নান করে পবিত্র হয়ে রান্না করবে। এতে প্রমাণিত হয় যে মহর্ষি শূদ্রদের প্রতি বৈষম্য বা ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন।

সমাধান — এখানে এটি তো প্রমাণিতই যে রান্নার কাজ কেবল শূদ্রদের দ্বারাই করানো হোক। যদি শূদ্রকে অস্পৃশ্য মনে করা হতো, যেমনটা সেই যুগে মনে করা হতো, তাহলে তাকে দিয়ে খাবার তৈরি করানোই হতো কেন ? মহর্ষি স্পষ্ট বলেছেন যে রান্নার কাজ কেবল শূদ্ররাই করুক, ব্রাহ্মণ আদিরা নিজেদের কাজ করুক। যার ফলে তারা বিদ্যা আদি অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, রাজ্য পালন, কৃষি ও ব্যবসা আদি করার জন্য বেশি সময় পেতে পারে। রইল কথা মুখে পট্টি বাঁধার, তো সেটি পরিচ্ছন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। প্রথমত, এটি খুব ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত যে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ আদি বর্ণ জন্ম থেকে নয়, কর্ম থেকেই হয় এবং ভগবান মনু থেকে শুরু করে মহর্ষি দয়ানন্দ জী পর্যন্ত এই একই মান্যতা রয়েছে। মহাভারত কাল থেকে এই মান্যতার পতন শুরু হয়েছিল, যা মহর্ষির সময়ে চরম আকারে পৌঁছেছিল, এর ফলে দেশে বিশাল সামাজিক ভাঙন দেখা দেয়। একটু ভেবে দেখুন যে দুর্ভাগ্যজনক সময়ে জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ, যে হয়তো কর্মে অতিশূদ্র ছিল, সে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের হাতের কাঁচা রান্নাও খেত না, সেখানে ব্রাহ্মণের ঘরে রান্নার কাজ শূদ্রই করুক — এমন কথা বলা সেই সময়ে কত বড় সাহসের কাজ ছিল ? কর্মভিত্তিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে যে খাবার তৈরি করছে তাকে শূদ্রই বলবে, তা সে নিজের মা, বোন, পত্নী আদি হোক না কেন ? তাই প্রমাণিত হল যে এর জন্যও মহর্ষি মুখে পট্টি আদি বাঁধার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন। খাবার তৈরিতে কারও উচ্ছিষ্ট অন্ন পড়ে যাওয়া অথবা শ্বাস লাগা কি পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের অনুকূল ? মহর্ষি তো এই সমুল্লাসেই স্ত্রী ও স্বামীকে একে অপরের উচ্ছিষ্ট খেতেও নিষেধ করেছেন, তাহলে অন্য কারও উচ্ছিষ্ট খাওয়ার পরামর্শ তিনি কীভাবে দিতে পারেন ? আধুনিক বিজ্ঞানও মহর্ষির মন্তব্যকে সমর্থন করবে। সকলের শরীরের প্রকৃতি ভিন্ন-ভিন্ন হওয়ার কারণে উচ্ছিষ্ট খাওয়া রোগব্যাধির কারণ হতে পারে। তাই তিনি মুখে পট্টি বাঁধার পরামর্শ দিয়েছেন। নখ কাটা, স্নানাদি করার পরামর্শও দিয়েছেন, যা স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত হয় যে এই সব কাজ পরিচ্ছন্নতা ও আরোগ্যের দৃষ্টিতে করা উচিত। এতে বৈষম্যের কোনো প্রশ্নই নেই। আপনি কি জানেন যে, একজন সার্জন যখন কোনো রোগীর অপারেশন করেন, তখন তিনি বাইরের জুতো পরতে পারেন না এবং সাধারণ পোশাকও পরতে পারেন না ?

বরং তিনি একটি বিশেষভাবে জীবাণুমুক্ত এবং পূর্ণ শুদ্ধ পোশাক পরিধান করেন এবং মুখ, নাক সব ঢেকেই অপারেশন করেন। তখন কি আপনি বলবেন যে সার্জন অস্পৃশ্য, এই কারণে তিনি মুখ-নাক সব ঢেকেছেন ? অথবা তিনি রোগীকে অস্পৃশ্য মনে করে তার গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য নিজের মুখ-নাক ঢেকেছেন ? আমি মনে করি আপনি এমন মিথ্যা ধারণা পোষণ করবেন না। এই ব্যবস্থা কর্ম অনুযায়ী কেবল শূদ্রদের জন্য নয় যারা ভোজন তৈরির কাজ করেন, বরং বর্তমানে মায়েদের জন্যও এমনটি করা উচিত। সেই সাথে চুলও ভালোভাবে বেঁধে খাবার রান্না করা উচিত যাতে খাবারে চুল ছিঁড়ে না পড়ে। আজ উন্নত মানের হোটেলগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে, সেখানে খাবার পরিবেশনকারী রুটি হাত দিয়ে না ধরে স্টিলের পরিচ্ছন্ন চিমটা দিয়ে পরিবেশন করেন। একে কি আপনি অস্পৃশ্যতা বলবেন নাকি পরিচ্ছন্নতা ? আশা করি এতে আপনার কোনো আপত্তি থাকবে না।

প্রশ্ন — আপনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে এমন যুক্তি দিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট করতে চাইছেন যা ন্যায়সঙ্গত নয়। এই একই সমুল্লাসে মহর্ষি এটাও লিখেছেন — ''চন্ডালের শরীর দুর্গন্ধযুক্ত পরমাণুতে পূর্ণ থাকে। ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণের তেমন নয়। তাই ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণের মানুষের হাতে খাবার খাওয়া এবং চন্ডাল আদি নিচু, ভাঙ্গি, চামার আদির হাতে না খাওয়া।'' এর থেকে স্পষ্ট যে ঋষি তাদের অস্পৃশ্য মনে করতেন।

উত্তর — এই বিষয়ে মহর্ষির মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে জানার জন্য এর পূর্ববর্তী প্রসঙ্গটিও জানা আবশ্যক। এই প্রশ্ন যে শূদ্রের স্পর্শ করা অন্ন খাওয়ায় যদি দোষ থাকে, তবে তাদের বানানো খাবার কীভাবে খাওয়া যায়? — এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি লিখেছেন — ''এই কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ যারা গুড়, চিনি, ঘি, দুধ, আটা, শাক-সবজি বা ফলমূল খেয়েছেন, তারা মূলত সারা বিশ্বের মানুষের হাতের তৈরি জিনিসই খেয়েছেন। কারণ যখন শূদ্র, চামার, ভঙ্গী, মুসলমান, খ্রিস্টান আদিরা ক্ষেত থেকে আখ কাটে....যখন এই পদার্থগুলো খেয়েছেন, তো ধরে নিন সবার হাতের খাবার খেয়েছেন। ... হ্যাঁ, মুসলমান, খ্রিষ্টান আদি মদ্য-মাংসাহারীদের হাতের খাবারে আর্যদেরও মদ্য-মাংসাদি পানাহার করার অপরাধ পিছু নেয়। কিন্তু নিজেদের মধ্যে আর্যদের এক সাথে ভোজন হওয়াতে কোনো দোষ হয় না।'' এই সম্পূর্ণ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিচার করলে কিছু বিষয় স্পষ্ট হয় —

1. যখন গুড়, চিনি, ঘি, দুধ আদি আমরা খাই, তখন কেবল উপরে উল্লিখিত সকলের হাতের খাবারই নয়, বরং পরোক্ষভাবে তাদের উচ্ছিষ্টও খেতে হয়।

2. মাংস ও মদ্য সেবনকারীদের হাতের খাবার এই কারণে খাওয়া উচিত নয়, কারণ তাদের সংস্পর্শে থাকলে এই পাপ আমাদের মধ্যেও আসার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

3. শরীর যদি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তবে তার হাতের খাবার স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে ক্ষতিকারক হয়। এই কারণে এমন ব্যক্তির হাতের তৈরি খাবার খাওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন যে চণ্ডাল আদি ব্যক্তিদের শরীর দুর্গন্ধযুক্ত পরমাণুতে পূর্ণ থাকে, তাই তাদের হাতে খাওয়া উচিত নয়। এখানে চণ্ডাল বলতে নিচ মেথর, চর্মকার আদি শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

নিষ্কর্ষ — গুড়, চিনি, ঘি, দুধ আদি খাওয়ার মাধ্যমে সবার ছোঁয়া বা উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয়ে যায় — এই কথা মহর্ষি সেই লোকদের উত্তর দেওয়ার জন্য বলেছেন যারা অস্পৃশ্যতার প্রবল সমর্থক হয়ে শূদ্রদের হাতের খাবার নিষেধ করেন। দ্বিতীয় কথা হল, যারা গুড়, খাড় আদি তৈরির ব্যবসায় নিযুক্ত আছে, সমাজ তাদের মেথর, চর্মকার বা অন্য কিছু যাই মনে করুক না কেন, তারা অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত কাজ করে না, ফলে তাদের শরীর দুর্গন্ধযুক্ত হয় না। সুতরাং গুড়, খাড় আদি খাওয়ার মতো তাদের হাতের তৈরি খাবার খাওয়ার মধ্যেও কোনো দোষ নেই। তবে এটি খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে তারা যেন মদ্য-মাংস আদির আহার না করে। কেউ যদি বলে যে গুড় ও খাড় প্রস্তুতকারীরাও যদি মদ্য-মাংস আহার করে, তবে কি গুড় আদি পদার্থও খাওয়া হবে না? এর উত্তর হল, এই সমস্ত পদার্থ উৎপাদনকারীদের পরীক্ষা করা সর্বত্র ও সর্বদাই সম্ভব নয় এবং তাদের সংস্পর্শও কেবল এই পদার্থগুলো খাওয়ার মাধ্যমে ঘটে না। এই কারণে মদ ও মাংসাহারী ব্যক্তিরা যদি গুড় আদি তৈরিও করে, তবুও কোনো দোষ হবে না। কিন্তু যদি তারা খাবার তৈরি করে পরিবেশন করে, তবে তাদের সংসর্গের কারণে দোষ আসবে। এই কারণে খাওয়া উচিত নয়। যেখানে দুর্গন্ধের কারণে খাবার খেতে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে চণ্ডাল আদি নিচ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। চণ্ডাল বলতে সেইসব লোকেদের বোঝানো হতো, যারা লোকালয় থেকে দূরে থেকে প্রচুর পরিমাণে মাংস আদি ব্যবহার করতো এবং অত্যন্ত নোংরা থাকতো। তাদের সাথে ভাঙ্গী, চামার আদির ব্যবহার ওইসব লোকেদের জন্য করা হয়েছে, যারা চণ্ডালদের মতো মাংসাহারী ও মদ্যপায়ী হলেও নোংরা ও ময়লা আদি পরিষ্কার করার কাজ করতো এবং পরিচ্ছন্নতা থেকে অত্যন্ত দূরে থাকতো। তারা গুড় প্রস্তুতকারীদের মতো পরিচ্ছন্ন কাজ করার লোক ছিল না। কথিত জন্মগত জাতি হিসেবে তারা ভাঙ্গী বা চামার আদি নামে সম্বোধিত হলেও, তারা যদি তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তবে তাদের হাতের তৈরি গুড়, খাঁড়, ঘি আদি খাওয়ার নিষেধ করা হয়নি। যেখানে এর উচ্ছিষ্ট বা নোংরামি মিশে

যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে গুড় আদি প্রস্তুতকারীদের এমনটা করাই উচিত। মহর্ষির দৃষ্টিতে তাদেরও পরিষ্কার থাকা এবং পরিচ্ছন্নতার সাথেই সব কাজ করা উচিত। কিন্তু তারা যদি এমনটা না করে, তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী এই ধরণের খাবার খাওয়া একটি বাধ্যবাধকতা হিসেবেও ধরা যেতে পারে। এটাও একটি সত্য যে গুড় আদি অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় তৈরি হওয়ার কারণে তা শুদ্ধ হয়ে যায়, অথচ খাবার তৈরির সময় অত উচ্চ তাপমাত্রা থাকে না। সেই সাথে খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা বড়জোর আপদকালেই হতে পারে। তখন প্রাণ রক্ষার জন্য দুর্গন্ধ ও হিংসাগ্রস্ত লোকেদের তৈরি খাবার খাওয়া বা তাদের সাথে থাকাটাও উচিত হবে। আমাদের এটাও দেখা উচিত যে পরিচ্ছন্নতা ও অহিংসার মতো পবিত্র ভাবসমূহকে ছোঁয়াছুঁয়ি, বৈষম্য বা ভেদাভেদের মতো ঘৃণ্য ও অধর্মযুক্ত আচরণের সাথে মেলানো উচিত নয়। খাবার প্রস্তুতকারী শূদ্রকে পবিত্রই থাকা উচিত, তা সে তার বাবা-মা যেকোনো নোংরা কাজ করার লোকই হোন না কেন। একটু ভেবে দেখুন, যদি কেউ নোংরা পরিষ্কার করার কাজ করে এবং সারাদিন এই কাজেই লিপ্ত থাকে, আর ভালো করে স্নান, মুখ বা শরীর শুদ্ধি না করে, মল ত্যাগের পর হাত ভালোভাবে ধৌত না করে, চামড়ার কাজ করতে করতে শরীরের অতি পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোযোগ না দেয়, তবে এমন পরিস্থিতিতে তার হাতের তৈরি খাবার তার পরিবারের লোকেদেরও খাওয়া উচিত নয়। তার ঘরে খাবার প্রস্তুতকারী মায়েদের তো পবিত্র থাকাই উচিত। আপনারা জানেন যে সব পরিবারেই মায়েরা রজঃস্বলা অবস্থায় রান্নাবান্না ও খাবারের কাজ থেকে দূরেই থাকেন। এটি প্রায় সবাই মেনে চলেন, তাহলে এটাকে কেন মায়েদের প্রতি বৈষম্যের প্রতীক হিসেবে দেখা হবে? আপনার হাত যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তবে কি আপনি সেই হাতে খাবার খেতে চাইবেন? যদি না চান, তবে মহর্ষিকে কেন দোষ দিচ্ছেন?

একটু ভেবে বলুন, যখন কোনো সার্জন কোনো রোগীর অপারেশন করেন, তখন কি তিনি কোনো সাফাই কর্মীকে সেই থিয়েটারে আসতে দেন? তিনি কি কোনো বৈষম্যের কারণে এমনটা করেন? সেই সার্জন শুধু সাফাই কর্মীকে নয়, বরং অন্য কোনো সার্জনকেও সঠিক পোশাক ও জীবাণুমুক্ত হওয়া ছাড়া সেখানে প্রবেশ করতে দেবেন না। একে কি আপনি অস্পৃশ্যতা বলবেন? যদি না হয়, তবে পাকশালা (রান্নাঘর), যা অপারেশন কক্ষের মতোই পবিত্র হওয়া উচিত, তার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কেন এমন প্রশ্ন তোলা হয়? আশ্চর্যের বিষয় হল, আজকের তথাকথিত সমাজবাদীদের পরিচ্ছন্নতা ও শুদ্ধতা নিয়ে ঘৃণা হচ্ছে, এ কেমন পাগলামি! যদি এমন সমাজবাদ সব ভোজনালয় ও হাসপাতালে কার্যকর করা হয়, তবে অনেক সংক্রামক রোগ

ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু যারা অন্যের গুণের মধ্যে দোষ এবং নিজের দোষের মধ্যে গুণ দেখতে অভ্যস্ত, তাদের চিকিৎসা কী হবে ?

প্রশ্ন — সত্যার্থ প্রকাশে বারবার ভঙ্গি, চমার ও নীচ শব্দগুলো কেন ব্যবহার করা হয়েছে ? এগুলো কি ঘৃণা বা বৈষম্যের সূচক নয়? এই শব্দগুলোর ব্যবহার কি কোনো মানবতাবাদীর জন্য শোভনীয় ?

উত্তর — হ্যাঁ, বর্তমান সময়ে এগুলোর ব্যবহার আপত্তিজনক মনে করা হয় এবং তা সত্যিই আপত্তিকর, কিন্তু এর সমাধানের জন্য এই পুস্তকেরই **'পথভ্রষ্টদের দম্ভ'** অধ্যায়টি মনোযোগ সহকারে পড়ার কষ্ট করুন, যেখানে ব লা হয়েছে যে ভাষা দেশ ও কাল অনুসারে পরিবর্তিত হতে থাকে। সেখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তবুও আমি আবার একটি উদাহরণ দিয়ে এটি স্পষ্ট করতে চাইবো। অতীতে কোনো ব্যক্তি প্রস্রাব করার বিষয়টিকে 'মুতনা' বলতেন, যা 'মূত্র প্রস্রবণে' ধাতু থেকে উৎপন্ন 'মূত্র' শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে। এই শব্দটি খারাপও নয় এবং অসভ্যতার প্রতীকও নয়, কিন্তু তার কিছু কাল পশ্চাৎ ইংরেজি সভ্যতার প্রভাবে সংস্কৃত শব্দ মূত্রের অপভ্রংশ 'মূত' বা 'মূতনা' শব্দগুলোকে অসভ্য ও গেঁয়োদের ভাষা হিসেবে গণ্য করা হতে থাকে। ইংরেজি ভাষার 'ইউরিন' শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হয়। এদিকে ভারতীয় সভ্যতার মানুষেরা 'লঘুশঙ্কা' শব্দের উদ্ভাবন করেন। ধীরে ধীরে ইউরিন ও লঘুশঙ্কা— উভয়ের পরিবর্তে মূত্রত্যাগের স্থানকে 'বাথরুম' বলা হতে থাকে এবং কেবল মূত্রত্যাগ নয় বরং মলত্যাগের স্থানকেও 'টয়লেট' শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা শুরু হয়। যে শব্দ এক সময় 'টট্টি ঘর' ছিল, পুনঃ 'পাখানা', পুনঃ 'ল্যাট্রিন' হয়ে আবার 'টয়লেট' হয়ে যায়। এখন মল ও মূত্রত্যাগ — উভয় স্থানকেই 'টয়লেট' নয় বরং 'বাথরুম' বলা হতে থাকে। স্নান ঘরও বাথরুম এবং মলমূত্র ত্যাগের স্থানও বাথরুম। এখন 'বাথরুম' শব্দটিও অসভ্য হয়ে গেছে। এর পরিবর্তে এখন 'ওয়াশরুম' প্রচলিত হয়েছে। আপনি রেলগাড়ি ও বিমানে এর পরিবর্তে Lavatory শব্দ দেখতে পারেন। আমি নতুন দিল্লিতে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আবাসে শৌচালয় ও মূত্রালয়ের জন্য Rest Room লেখা দেখেছি। দেখে অবাক হয়েছি এবং ইংরেজি ভাষাবিদদের এই চঞ্চলতা দেখে হাসিও পেয়েছে। ভবিষ্যতে এর পরিবর্তে আরও অন্য কোনো শব্দ আসতে পারে। এটি ভাষারই এক প্রবাহ। আমাদের এখন এটি বলতেও লজ্জা লাগে যে আমি মূত্রত্যাগ বা শৌচকর্মের জন্য যাচ্ছি। একটু ভেবে দেখুন, আজ যদি কেউ বলে আমি 'মূততে' বা 'মল ত্যাগ' করতে যাচ্ছি, তবে আপনি হেসে ফেলবেন এবং তাকে অসভ্য বলবেন; আর আপনি নিজে বাথরুম

শব্দ ব্যবহার করে কি সভ্য ও প্রগতিশীল হয়ে গেলেন ? এভাবেই ভাষা পরিবর্তন হয়। এর জন্য কাউকে দোষী মনে করা উচিত নয়। এটি ভাষার একটি স্বাভাবিক গুণ।

অতএব, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর সময়ে যে শব্দগুলো প্রচলিত ছিল, সেগুলোই ব্যবহার করেছেন। এগুলো নিয়ে শোরগোল করা উচিত নয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, আজ কিছু কথিত উচ্চ পর্যায়ের বৈদিক বিদ্বানরাও এই শব্দগুলোকে ভয় পেয়ে ঋষির ভাষাকে সংশোধন করার ওকালতি করতে শুরু করেছেন। প্রাচীনকালের সকল গ্রন্থের ভাষাকে সংশোধন করা কি লেখকদের প্রতি ন্যায়বিচার হবে ? এমনটা করার অধিকার কি কারো থাকতে পারে ? আমার দৃষ্টিতে কখনো নয়। তবে হ্যাঁ, বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার ওপর নিজের মন্তব্য দেওয়া যেতে পারে। তবে এটুকু অবশ্যই যে বর্তমানে ‘ভঙ্গি’, ‘চমার’ আদি শব্দের প্রয়োগ করা উচিত নয়, কারণ বর্তমান ভাষায় এই শব্দগুলো ভালো বলে গণ্য হয় না; কিন্তু যদি কোনো পুরাতন গ্রন্থের ভাষাকেই বদলে ফেলা হতে থাকে, তবে ভাষার পরিবর্তনের ইতিহাসই সমাপ্ত হয়ে যাবে। তখন তো সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থগুলো সংশোধন করতে হবে, কিন্তু বিশ্বের কোনো সম্প্রদায় বা সমাজ কি এমনটা করতে চাইবে? তারপর গ্রন্থ সংশোধনের প্রক্রিয়াটি কি নিরন্তর চলতে থাকবে ?

* * * * *

বিনম্র নিবেদন

মান্যবর! আশা করি, আপনি আচার্যজীর কাজ আর গুরুত্বকে ভালো ভাবে জেনে গেছেন। যদি আপনার হৃদয় আর মস্তিষ্ক বেদের এই অপূর্ব কাজের জন্য উৎসুক হয়েছে আর আপনি আমাদের সহযোগিতা করতে চান, তাহলে আপনি আমাদের যজ্ঞতে নিম্ন প্রকারে সহযোগী হতে পারেন —

1. প্রতিবর্ষ ন্যূনতম 12,000/- টাকা দান করে ট্রাস্টের সহযোগী সংরক্ষক হতে পারেন অথবা একবার ন্যূনতম এক লক্ষ টাকা দান করে আজীবন সহযোগী সংরক্ষক হতে পারেন।
2. প্রতিবর্ষ ন্যূনতম 6,000/- টাকা দিয়ে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হতে পারেন অথবা একসাথে ন্যূনতম 50,000/- টাকা দিয়ে বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য হতে পারেন।
3. বার্ষিক ন্যূনতম 1,000/- টাকা দিতে থেকে সহযোগী সদস্য হতে পারেন।

নোট — উপরোক্ত সকল সহযোগী মহানুভাবকে ন্যাসের সি.এ. দ্বারা করা বার্ষিক ওডিট রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যে মহানুভাব স্বয়ং দান করতে পাবেন না, সেই মহানুভাব অন্যদের প্রেরিত করে অন্ততঃ 8 সদস্য আদি বানিয়ে স্বয়ং নিঃশুল্ক সেই শ্রেণীর সদস্য বা সহযোগী সংরক্ষক আদি হতে পারেন।

4. বয়োবৃদ্ধ বিদ্বান, সন্ন্যাসী, সাধু, মহান বৈজ্ঞানিক মহানুভাব নিজেদের আশীর্বাদ তথা বৌদ্ধিক সহায়তা দিতে পারেন।
5. বিদ্যার্থী, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী আদি নিজেদের পবিত্র আহুতি শ্রদ্ধা ও সামর্থ্য অনুসারে প্রদান করতে পারেন।

* * * * *

বিশেষ নিবেদন

এই কাজ অত্যন্ত পবিত্র, এই কারণে আচার্য শ্রীর ভাবনানুসারে বিনম্র নিবেদন যে, যাদের আজীবিকা কোনো ধরণের হিংসা, চুরি, চোরাচালান, অশ্লীলতাবর্ধক সাধন, নেশা জাতীয় বস্তুর বিক্রি, প্রতারণা, শোষণ আদির উপর নির্ভর করে তথা যে সকল নির্ধন ভাই নিজের সামর্থ্যের অধিক (অথবা নিজের পরিবারের ক্লেশ করে) দান দিতে চাইছেন, এমন মহানুভাবদের সদ্ভাবনার ধন্যবাদ করেও আমরা তাদের দান নিতে সক্ষম নই। দয়া করে এমন করার চেষ্টা করে আমাদের লজ্জিত করবেন না। তবে হ্যাঁ, যে বন্ধু এমন কাজকে ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গে জুড়তে চান, তাহলে তাদের সাদর আমন্ত্রন জানাই। সংস্থানের সঞ্চালন হেতু দয়া করে এই দুটো খাতায় দান করতে পারেন —

Bank Name	Punjab National Bank
A/c Holder	Shri Vaidic Swasti Pantha Nyas
A/c Number	4474000100005849
Branch	Bhinmal
IFS Code	PUNB0447400

অথবা

Bank Name	State Bank of India
A/c Holder	Shri Vaidic Swasti Pantha Nyas
A/c Number	61001839825
Branch	Khari Road, Bhinmal
IFS Code	SBIN0031180

জ্ঞাতব্য হল, বৈদিক বিজ্ঞানের অগ্রিম এবং উচ্চ স্তরীয় বিশাল শোধ সংস্থান হেতু 30 বিঘা ভূমি সিরোহী (রাজস্থান) নগর থেকে রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ–62 থেকে প্রায় সোয়া কি.মি. দূর পালড়ী (এম) রাজস্ব গ্রামের মধ্যে ক্রয় করা হয়েছে। এই সংস্থানের নির্মাণের আনুমানিক বাজেট হল 10 কোটি টাকা। যে মহানুভাব এই মহান যজ্ঞতে নিজের পবিত্র আহুতি (বড় রাশি) দিতে ইচ্ছুক, তারা নিম্ন লিখিত খাতায় ধন দান করতে পারেন।

Bank Name	**Axis Bank**
A/c Holder	Shri Vaidic Swasti Pantha Nyas
A/c Number	921010017739651
Branch	Bhinmal
IFS Code	UTIB0003757

আপনি আপনার চেক/ড্রাফ্ট/ধনাদেশ, **‘শ্রী বৈদিক স্বস্তি পন্থা ন্যাস’** PAN No. AAATV7229A এর নাম (কেবল খাতায় দিবেন) দেওয়ার কষ্ট করবেন, তার সঙ্গে দয়া করে নিজের নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখে অবশ্যই পাঠিয়ে দিবেন। আপনি অনলাইনেও ধন জমা করতে পারেন, কিন্তু এমন করা মহানুভাব নিজের নাম ও ঠিকানা দুর্ভাষ দ্বারা তৎকাল সূচিত করার কষ্ট করবেন যাতে সঠিক সময়ে রশিদ পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে, অন্যথা আমাদের অনেক কঠিন হয়ে যায়।

নোট — ন্যাসকে দেওয়া দান আয়কর অধিনিয়ম 1961 ধারা 80–জি অন্তর্গত কর মুক্ত আছে।

Donations now accepted through BHIM/UPI also

UPI Address shrivspnyas@upi

মাননীয় ডাঃ সত্যপাল সিং জী, ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রীকে 'বেদবিজ্ঞান-আলোকঃ' গ্রন্থটি উপহার দেওয়ার মুহূর্ত

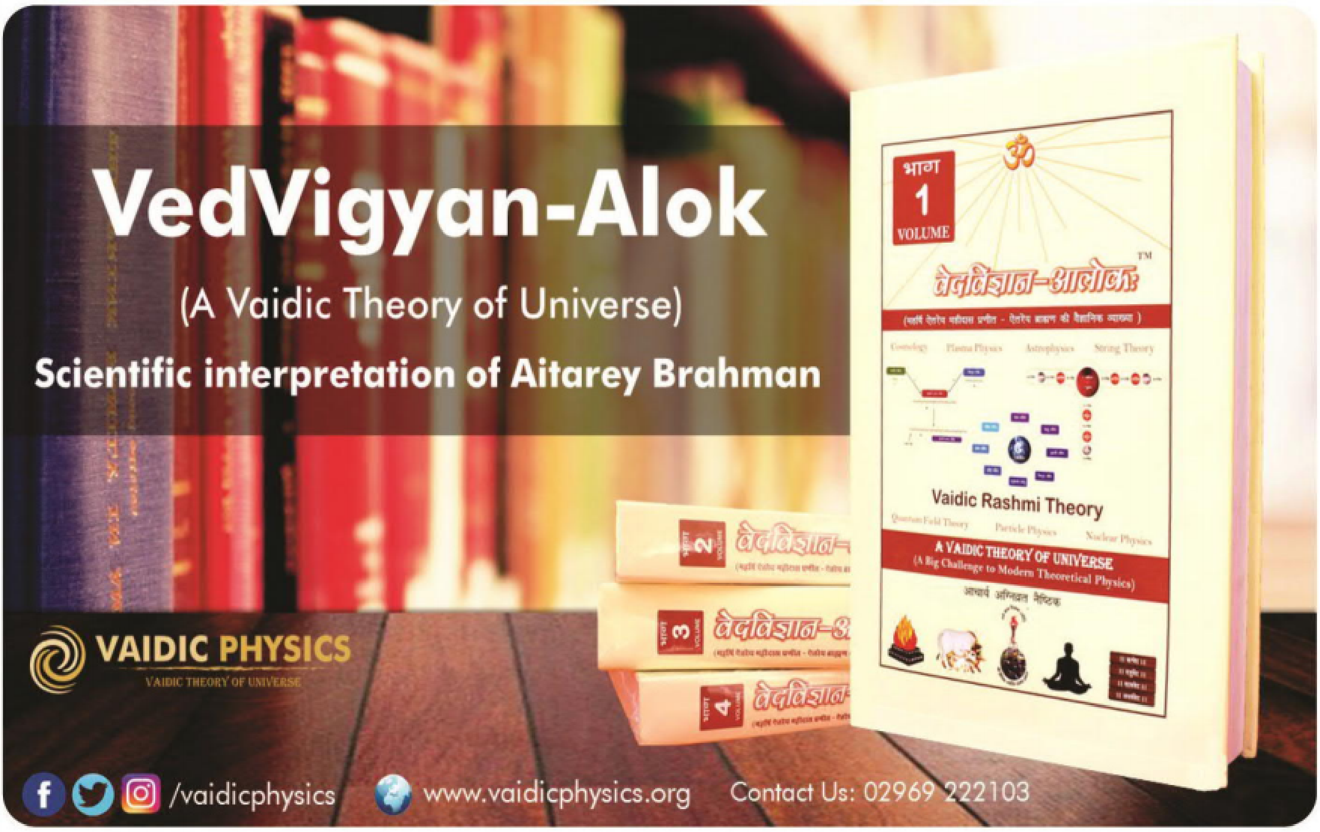

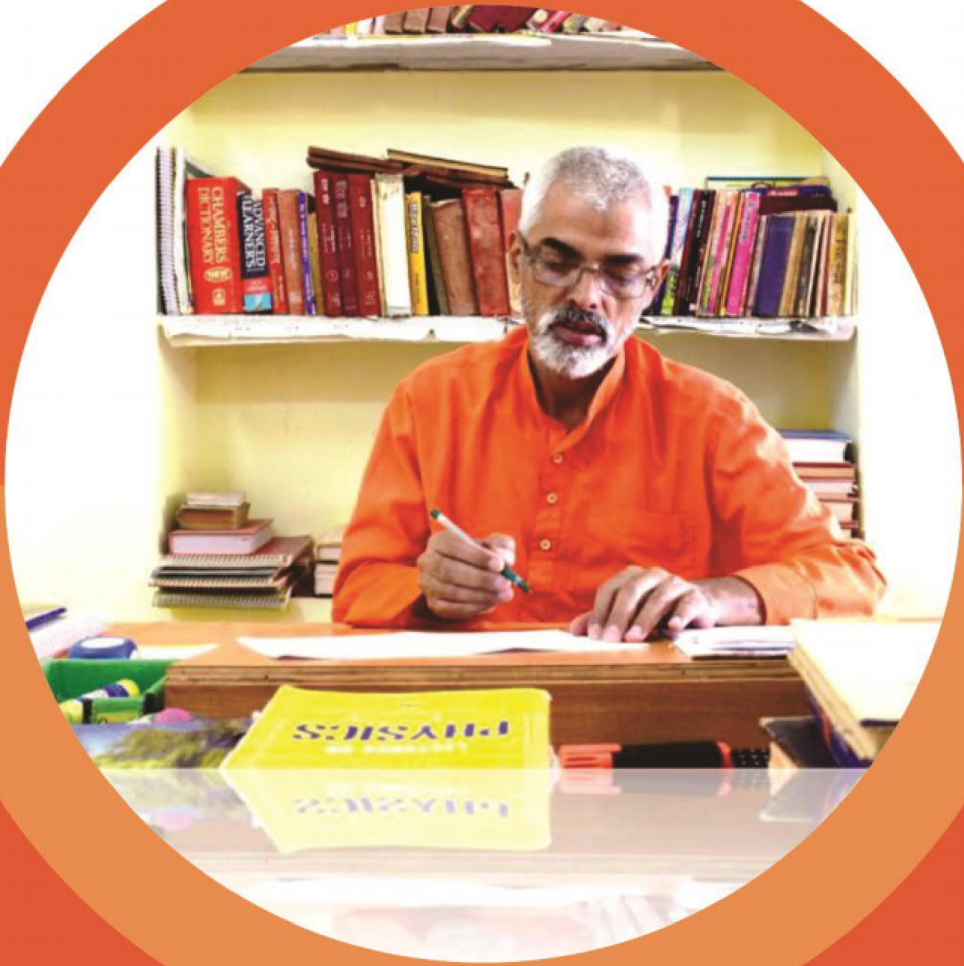

প্রায়ই দেখা গেছে যে, আধুনিক সুশিক্ষিত পাঠকদের **সত্যার্থ প্রকাশ** গ্রন্থ পড়ার সময় কিছু ভ্রান্তি বা ভুল ধারণা তৈরি হয়, যার কারণে তারা **সত্যার্থ প্রকাশ** নিয়ে ব্যঙ্গ করতে শুরু করেন। এমন মহানুভবদের উচিত যে, তারা যেন এই পুস্তকটি একবার মনোযোগ দিয়ে পড়েন; এতে তাদের সমস্ত ভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে এবং **সত্যার্থ প্রকাশ**-এর গুরুত্ব নিজে থেকেই বুঝতে পারবেন।

— **আচার্য অগ্নিব্রত নৈষ্ঠিক**

/vaidicphysics